বিশ্ব দর্শন দিবস ২০২৪

স্মরণিকা

সম্পাদক
ড. কাজী এ এস এম নুরুল হুদা

দর্শন বিভাগ
গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র
ও
নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ব দর্শন দিবস ২০২৪

স্মরণিকা

দর্শন বিভাগ
গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র ও নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

World Philosophy Day 2024

Souvenir

Department of Philosophy
Dev Centre for Philosophical Studies & Centre for Moral Development
University of Dhaka

ব্যবস্থাপনা কমিটি
আহ্বায়ক
অধ্যাপক ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী
সদস্যবৃন্দ
অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিন
অধ্যাপক মো. নূরুজ্জামান
অধ্যাপক আ খ ম ইউনুস
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ দাউদ খাঁন
জনাব আহম্মদ উল্লাহ
ড. কাজী এ এস এম নুরুল হুদা

Managing Committee
Convenor
Professor Dr. Shah Kawthar Mustafa Abululayee
Members
Professor Dr. Jasim Uddin
Professor Md. Nuruzzaman
Professor A K M Yunus
Professor Dr. Mohammed Daud Khan
Mr. Ahammad Ullah
Dr. Kazi A S M Nurul Huda

সম্পাদনা পরিষদ
সম্পাদক
ড. কাজী এ এস এম নুরুল হুদা
সদস্যবৃন্দ
অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিন
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ দাউদ খাঁন
জনাব আহম্মদ উল্লাহ

Editorial Board
Editor
Dr. Kazi A S M Nurul Huda
Members
Professor Dr. Jasim Uddin
Professor Dr. Mohammed Daud Khan
Mr. Ahammad Ullah

মুদ্রণ: বেঙ্গল কম-প্রিন্ট
৬৮/৫, গ্রিন রোড, পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ০১৭১৩-০০৯৩৬৫, ০১৮২২-৮২৮৮৬৯

World Philosophy Day 2024: Souvenir, Edited by : Dr. Kazi A S M Nurul Huda and Published by The Department of Philosophy, University of Dhaka, Dhaka-1000, Bangladesh Published: November 21, 2024

এ স্মরণিকার নিবন্ধসমূহে প্রকাশিত অভিমত সম্পূর্ণরূপে লেখকের একান্ত নিজস্ব। এজন্য সম্পাদনা পরিষদ বা প্রকাশক কোনোভাবে দায়ী নয়।

উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শুভেচ্ছা বাণী

বিশ্ব দর্শন দিবস ২০২৪ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সকল বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। নভেম্বর মাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার বিশ্বব্যাপী পালিত এই দিনটি আমাদের জীবনে দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা, এর রূপান্তরকারী শক্তি এবং সমাজের নৈতিক ও বৌদ্ধিক ভিত্তি গঠনে এর ভূমিকা সম্পর্কে প্রতিফলনের একটি সুযোগ।

এই দিবসের উদ্‌যাপন একটি গভীর তাৎপর্য বহন করে। কারণ এদিনে আমরা সেই বিভাগের অবদানকে স্মরণ করছি যা ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দশক পর দশক ধরে, এই বিভাগ বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারা এবং দার্শনিক আলোচনার এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছে, যার কাজ স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এক গভীর প্রভাব ফেলেছে।

বিশ্ব দর্শন দিবস উদ্‌যাপন আমাদের দেশে সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য যারা লড়াই করেছেন তাদের উত্তরাধিকারকে সম্মান করার সময়। এই উপলক্ষে আমি ২০২৪ সালের শিক্ষার্থী-জনতার অভ্যুত্থানে শহিদ এবং আহত আন্দোলনকারীদের প্রতি সশ্রদ্ধচিত্তে সম্মান জানাই। তাদের সাহসিকতা এবং দৃঢ়তা কেবল আমাদের দেশের ইতিহাসের গতিপথই তৈরি করেনি বরং অন্যায়ের মোকাবেলায় সম্মিলিত পদক্ষেপের শক্তিকেও তুলে ধরেছে। ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের অন্বেষণে এসব ব্যক্তিদের আত্মত্যাগ সামাজিক আন্দোলনের দিকনির্দেশনায় দর্শনের অব্যাহত প্রাসঙ্গিকতার অনুস্মারক হিসেবে কাজ করে।

২০২৪ সালের অভ্যুত্থান হলো সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নামক দার্শনিক আদর্শের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি, যা আমাদের বৌদ্ধিক অনুসন্ধান পরম্পরার দীর্ঘদিনের অংশ। এ অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীরা তাদের অধিকার এবং মর্যাদার জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে সেসব মৌলিক নীতি মূর্ত করেছেন, যা জন রলস, আইরিস ম্যারিয়ন ইয়াং এবং অমর্ত্য সেনের মতো দার্শনিকরা তাঁদের কাজের মাধ্যমে প্রচার করেছেন। তাঁদের এই উত্তরাধিকার নিপীড়নকে চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের সহজাত অধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় যে দীর্ঘ সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত দেয়, তা আমাদের গভীরভাবে ভাবিত করে।

বিশ্ব দর্শন দিবস ২০২৪-এর তাৎপর্য সম্পর্কে চিন্তা করার সাথে সাথে বাংলাদেশী তরুণদের দেখানো দৃঢ়তা এবং সাহসিকতায় আমাদের উদ্বুদ্ধ হতে হবে। সমতা, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে আমরা নতুন করে অঙ্গীকার করতে পারি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ আমাদের জন্য একটি ঐতিহাসিক মঞ্চ হয়ে থাকবে, যেখানে গঠনমূলক চিন্তা, সত্যানুসন্ধান এবং বৌদ্ধিক প্রগতি অব্যাহত থাকবে, যা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

আসুন আমরা এই বিশ্ব দর্শন দিবসকে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে দর্শনের গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করার একটি উপলক্ষ হিসেবে ব্যবহার করি এবং সেসব ব্যক্তিদের সম্মান জানাই যারা আমাদের জন্য লড়াই করে সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছেন।

পরিশেষে, আমি বিশ্ব দর্শন দিবস ২০২৪-এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি এবং এ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

[অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান, পিএইচডি]

ডিন
কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শুভেচ্ছা বাণী

বিশ্ব দর্শন দিবস ২০২৪ উপলক্ষে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার উদ্‌যাপন করতে সংশ্লিষ্ট থাকতে পেরে আমি সম্মানিত। এই বিভাগটি শত বছর ধরে আমাদের দেশে বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধানের একটি শক্তিশালী স্তম্ভ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমাদের জাতির সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে।

এই বছর আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ দিনটি উদ্‌যাপন করার পাশাপাশি ২০২৪ সালের শিক্ষার্থী-জনতার অভ্যুত্থানের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আহত আন্দোলনকারীদের প্রতিও জানাই সম্মান। সমতা, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র এবং মানবিক মর্যাদার প্রতি তাদের অবিচলিত সংকল্প আমাদের সম্মিলিত চেতনায় এক অমোঘ চিহ্ন রেখে গেছে। এই সাহসী তরুণরা একটি উন্নত ভবিষ্যতের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং মুক্তি ও সমতার মতো আদর্শের প্রতীক হয়ে উঠেছে। আমরা শিক্ষক হিসাবে আমাদের কাজের মাধ্যমে সেই আদর্শকে সমুন্নত রাখতে চাই। তাদের ত্যাগ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, জ্ঞানের অন্বেষণ শুধুমাত্র একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াস নয়, এটি সমাজের কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত একটি নৈতিক প্রচেষ্টাও বটে।

বিশ্ব দর্শন দিবস আমাদেরকে ন্যায়ভিত্তিক বিশ্ব গঠনে সবিচার চিন্তা, নৈতিক দায়িত্ব এবং শিক্ষার ভূমিকা সম্পর্কে নতুন করে সুগভীর চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ করে দেয়। এই চেতনা ধারণ করে দর্শন বিভাগ শিক্ষার্থীদের প্রচলিত পাঠক্রমের বাইরে গিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতি গভীর মনোযোগ ও আগ্রহী হয়ে ওঠার জন্য অনুপ্রাণিত করছে বলে আমার বিশ্বাস।

আজকের এই দিনে আসুন বিদ্যায়াতনিক কাজ ও একটি উন্নত ভবিষ্যতের জন্য আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রতি দৃঢ় সংকল্প জানিয়ে সমতা, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র এবং মানবিক মর্যাদার আদর্শের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার পুনর্নবীকরণ করি।

যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিশ্ব দর্শন দিবস ২০২৪-এর এই আয়োজন সম্ভব হয়েছে তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সবাইকে বিশ্ব দর্শন দিবস ২০২৪-এর শুভেচ্ছা।

[অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান]

চেয়ারম্যান
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শুভেচ্ছা বক্তব্য

এবারের বিশ্ব দর্শন দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে এক নতুন পরিবেশে। দীর্ঘদিন বাংলাদেশের মানুষ ছিল অধিকার বঞ্চিত। ন্যায়-নৈতিকতার যে মন্ত্র দর্শন বিষয়গতভাবে ধারণ করে ৫ আগস্ট ২০২৪ এর পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে তা অনেকটাই অনুপস্থিত ছিল। যে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশের জন্ম তা নির্বাসিত থাকে দীর্ঘদিন। শাসকেরা ভুলেই গিয়েছিলেন গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তারা একসময় আন্দোলন করেছিলেন। ছাত্র-জনতার বিপ্লব বাংলাদেশকে আবারো ন্যায়-নীতির ও যৌক্তিক পথে চলার সুযোগ এনে দিয়েছে নতুনভাবে। এই সুযোগ যথার্থভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের তরুণ সমাজের নেতৃত্বে এই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, যা অনেকের কাছেই ছিল অকল্পনীয়, একে ব্যর্থ হতে দেয়া যাবে না। দার্শনিকদের এখন দায়িত্ব হলো নির্মোহভাবে এই বিপ্লবের ফসল বাংলাদেশের জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার যথার্থ দিক-নির্দেশনা প্রদান করা। বাংলাদেশকে পরিচালিত হতে হবে ন্যায় ও যুক্তির ভিত্তিতে। হীন স্বার্থে, গোষ্ঠী স্বার্থে বা দলীয় স্বার্থে দেশকে পরিচালনা করা যাবে না। দ্বৈতনীতির অবক্ষণ হতে হবে, সকলের জন্যে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে হবে। সম্পদের সুষম বণ্টনের পথ খুঁজতে হবে। পরার্থবাদী রাজনৈতিক দর্শনের আলোকে শাসনব্যবস্থার সাথে যাঁরা জড়িত আছেন বা ভবিষ্যতে হবেন তাঁদের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের তরুণ সমাজ, নিরীহ জনগণ পরার্থপরতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে– জীবন উৎসর্গ করে এই পরিবর্তন সাধন করেছেন। অতএব, রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারক ও শাসনকার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সততা ও পরার্থপরতার দর্শনকে পরিপূর্ণভাবে ধারণ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দার্শনিকদের অত্যন্ত গভীরভাবে ফিলিস্তিনের অসহায় নিরাপরাধ মানুষদের ওপর নির্মম হত্যাকাণ্ডের– বিশেষ করে নারী ও শিশুদেরকে যে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হচ্ছে, সেসব বিষয় নিয়ে শুধু ভাবলেই চলবেনা, জোরালো প্রতিবাদ করে রাস্তায় নামতে হবে। শুধু যৌক্তিক প্রতিবাদ করে থেমে গেলেই চলবে না যতক্ষণ এই বর্বরোচিত হামলা বন্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কঠোর প্রতিবাদ অব্যাহত রাখতে হবে। আমাদের কাছে এটি সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ফিলিস্তিন বিষয়ে বিশ্বময় দার্শনিক সমাজের নীরবতা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সত্য, যুক্তি ও ন্যায়ের ধারক হিসাবে সারা দুনিয়ার দার্শনিকদের ফিলিস্তিনের অসহায় জনসাধারণের স্বপক্ষে অবস্থান নেয়া এবং তাদের স্বাধীন আবাসভূমি নিশ্চিত করার বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখা এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলে আমরা মনে করি।

আমাদের এবছরের (২০২৪ সনের) বিশ্ব দর্শন দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে ২১ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার। ইউনেস্কো ২০০২ সনের ২১ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার প্রথম বিশ্ব দর্শন দিবস পালনের মধ্য দিয়ে প্রতিবছর নভেম্বর মাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার বিশ্ব দর্শন দিবস পালনের রেওয়াজ চালু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ সে নিয়মেই বিশ্ব দর্শন দিবস পালন করে যাচ্ছে। এবারের বিশ্ব দর্শন দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল "Philosophy for an Inclusive and Sustainable Future"। বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা নেই বললেই চলে। অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণে দার্শনিকেরা কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারেন তা নিয়ে আমাদের ভাবনার অবকাশ রয়েছে। সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান দার্শনিকদের নৈতিক দায়িত্ব বলে আমরা মনে করি।

এটি আমাদের সবারই জানা আছে যে, দর্শন বিভাগের বয়স আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স একই। এই বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকগণ দেশে ও দেশের বাইরে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় উপাচার্য প্রফেসর জে এইচ ল্যাংলী দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ও প্রথম বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে তোলার পেছনে তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। সে হিসাবে তাঁর কোন স্বীকৃতির স্বাক্ষর এখানে এখন পর্যন্ত মেলেনি। তাঁর অবদানের সম্মানজনক স্বীকৃতির জন্য আমরা দাবি জানাচ্ছি।

অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারো বিশ্ব দর্শন দিবস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র ও নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে পালিত হচ্ছে। গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিন এবং নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক আ খ ম ইউনুসকে এই সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশ্ব দর্শন দিবসের এবারের মূল বক্তা অধ্যাপক আ খ ম ইউনুস। তাঁকে সেই জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশ্ব দর্শন দিবস উপলক্ষে এবারের স্মরণিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করছেন ড. কাজী এ এস এম নুরুল হুদা। তিনিসহ সম্পাদনা পরিষদের সকল সদস্যদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান, পিএইচডি বিশ্ব দর্শন দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার সম্মতি প্রদান করায় তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানকে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার জন্য জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

বিভাগের সহকর্মীবৃন্দের যাঁরা অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ।

সবাইকে বিশ্ব দর্শন দিবস ২০২৪-এর শুভেচ্ছা।

খোদা হাফেজ।

[অধ্যাপক ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী]

পরিচালক
গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শুভেচ্ছা বক্তব্য

দর্শন এমন একটি সর্বজনীন বিষয় যা মানুষের চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, অস্তিত্ব এবং জ্ঞানের মতো ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করে। যদিও ইতিহাসের পথ-পরিক্রমায় এবং প্রয়োজনের নিরিখে দার্শনিক আলোচনায় নানা পরিবর্তন এসেছে। তথাপি দর্শনই আমাদের বর্তমান পৃথিবীকে গঠন করতে সহায়তা করেছে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বিশ্বের সমাজগুলোকে কল্যাণকর করতে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

দার্শনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সময়োপযোগী প্রকৃত মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দিয়ে বাস্তব জগৎ সম্পর্কে আমাদের বৌদ্ধিক কৌতূহল সৃষ্টির পাশাপাশি দর্শন আমাদেরকে যুক্তিনিষ্ঠ উপায়ে জাগতিক বিভিন্ন জটিল প্রশ্ন বিশ্লেষণ করার ও তার প্রয়োগভিত্তিক সমাধান অন্বেষণে পথনির্দেশনা দিয়ে থাকে। তবে পরিতাপের বিষয় হলো আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে অভূতপূর্ব অগ্রগতি আমাদের জীবনযাপন ব্যবস্থাকে সহজ ও আরামদায়ক করলেও তাকে টেকসই করতে পেরেছে কিনা সে প্রশ্ন থেকেই যায়। কেননা আমরা হয়তো অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি কিন্তু এর বিপরীতে সারাবিশ্বের মানুষের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে আদর্শ, মূল্যবোধ, সামাজিক ন্যায্যতা প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় অলংঘনীয় বিভক্তি তৈরি হয়েছে। পরিণতিতে সমন্বিত সামাজিক কাঠামো গঠনের পরিবর্তে সামাজিক বৈষম্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এ ব্যাপারে সবাই একমত পোষণ করবেন যে সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই পৃথিবী গঠন করতে সমন্বিত বিশ্ব সমাজ সৃষ্টির বিকল্প নেই।

প্রকৃত, সঠিক উপায়ে যথার্থ ও সময়োপযোগী দর্শন চর্চার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বৈচিত্রকে তুলে ধরার পাশাপাশি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত বিষয়াবলী যা মানুষের অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ করে সেগুলো সম্পর্কে পারস্পরিক বোঝাপড়া সৃষ্টি ও সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজ, দেশ, জাতি ও আন্তর্জাতিক পরিসীমায় বিদ্যমান সামাজিক ব্যবধান দূর করে সমন্বিত এক বিশ্ব সমাজ তৈরি করা সম্ভব হতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

এটি অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের বিষয় যে, আদর্শ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষিতে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগ বিশ্ব দর্শন দিবস উদ্‌যাপন করছে এবং সে ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে স্মরণিকা প্রকাশ করেছে। দর্শন বিভাগের এই মহতি আয়োজনের যৌথ উদ্যোক্তা হতে পেরে গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে আমি সম্মানিত বোধ করছি। পরিশেষে সামগ্রিক আয়োজনের সফলতা এবং সারা বিশ্বের মানুষের জন্য শান্তি ও কল্যাণ কামনা করছি।

[অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিন]

পরিচালক
নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শুভেচ্ছা বক্তব্য

৫ আগস্ট ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান আমাদের দেশ ও জাতির মধ্যে নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। স্বাধীনতার ৫৩ বছরেও আমরা সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি করতে ব্যর্থ হয়েছি। এ ব্যর্থতা গত সাড়ে ১৫ বছরে আরো গভীরে পতিত হয়েছে। রাজনীতিতে মিথ্যাচারিতা, ভণিতা, প্রহসন, লৌকিকতা, অন্তসারশূন্যতা, কথা ও কাজের মিল না থাকা, এক কথায় একটি মেকি কালচার এখানে চালু হয়েছিল। ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থান এ থেকে মুক্তির একটি সুযোগ এনে দিয়েছে। ছাত্র-জনতার ন্যায় এ দেশের দার্শনিকদেরও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে যাতে বৈষম্য ও শোষণহীন সমাজ এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। তাইতো বিশ্ব দর্শন দিবস ২০২৪-এর এত আয়োজন। এ আয়োজনকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

অন্যায়-অপকর্ম, দুঃশাসন, দুর্নীতি, নির্যাতন-নিপীড়ন, কূট-কৌশল, মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি স্বগতভাবেই ক্ষয়িষ্ণু। কাঁচের ন্যায় ভঙ্গুরতার প্রবণতা এর মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। এর স্থায়িত নেই। এর ক্ষয়িষ্ণু প্রবণতা এর মধ্যে ধ্বস নামাবেই। ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতা নিজেদেরকে রক্তস্রোতে ভাসিয়ে আমাদেরকে মর্মে মর্মে এটি বুঝিয়েছে।

তাই তরুণ প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা অনেক বেশি। তাদের প্রতি যেন কোনভাবে যুলুম ও বৈষম্য করা না হয়, সে দায়িত্ব আমাদের সমাজচিন্তক ও রাজনীতিবিদদের নিতে হবে। ব্যক্তি, সমাজ, রাজনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে যুলুম-নির্যাতনের পথ পরিহার করতে হবে। শত্রুর প্রতিও যুলুম নয়; স্বজনের জন্য বাড়তি সুবিধা নয় এবং অণু পরিমাণও দুর্নীতি নয়। এ হোক ২০২৪ দর্শন দিবসের প্রতিজ্ঞা।

বিশ্ব দর্শন দিবস ২০২৪-এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

[অধ্যাপক আ খ ম ইউনুস]

সম্পাদক
বিশ্ব দর্শন দিবস ২০২৪ স্মরণিকা
দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকীয়

As we mark World Philosophy Day 2024, it is both a pleasure and a profound responsibility to present this Souvenir, a collective effort by the University of Dhaka's Department of Philosophy, the Dev Center for Philosophical Research, and the Moral Development Center. This occasion underscores the enduring importance of philosophical inquiry in our lives, an inquiry that remains as relevant today as ever, particularly in the dynamic and rapidly evolving context of Bangladesh.

Philosophy, with its rich tradition of probing fundamental questions about existence, ethics, knowledge, and the meaning of life, plays an indispensable role in shaping not only academic thought but also the very fabric of society. In Bangladesh, where we face a complex web of social, political, and environmental challenges, philosophy provides the tools to critically examine our values, principles, and practices. It encourages engagement with difficult questions on justice, equality, democracy, or environmental sustainability and urges us to seek thoughtful, reasoned solutions to these issues.

In our current context, marked by rapid urbanization, political polarization, and the effects of climate change, philosophy serves as a vital source of reflection and guidance. It compels us to confront moral dilemmas and question the structures that shape our lives. As Bangladesh navigates the complexities of development, globalization, and modernity, the philosophical perspectives explored in this Souvenir offer a critical lens through which we can view both our successes and shortcomings. Philosophy invites us not just to reflect on the world around us but also to actively shape it for the better, with a commitment to justice, empathy, and intellectual rigor.

This Souvenir brings together the collective contributions of the Department of Philosophy's esteemed faculty members, whose research and teaching continue to shape the intellectual landscape of Bangladesh. Each piece in this collection reflects the breadth and depth of philosophical inquiry and its direct relevance to the pressing issues of our time. From ethics and political theory to the philosophy of education and beyond, these contributions highlight our shared commitment to advancing philosophy as a tool for both personal and societal development.

A special acknowledgment and heartfelt thanks are due to Professor Abul Khayr Md. Yunus for his insightful keynote paper, **"বাংলাদেশে ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানের দর্শন: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি"** [Philosophy of the 2024 Upspring in Bangladesh: An Islamic Perspective]. His paper adds a unique and thought-provoking dimension to this publication, offering a philosophical

interpretation of the 2024 mass uprising in Bangladesh through an Islamic perspective. This invaluable contribution underscores the diversity and richness of philosophical thought and serves as an inspiration for further reflection and dialogue.

As the Department of Philosophy at the University of Dhaka continues to nurture the intellectual growth of future generations, we remain steadfast in our commitment to cultivating philosophical dialogue that is not just theoretical but also grounded in the realities of contemporary life. The collaboration between our department, the Dev Center for Philosophical Research, and the Moral Development Center exemplifies our shared vision of promoting philosophy as a means of personal enrichment and societal betterment.

I express my sincere gratitude to all those who contributed to this publication. To our faculty members, your scholarship has enriched this Souvenir. To the editorial board and organizers, your efforts have brought this publication to life. We also acknowledge the vital support of our teachers and non-academic staff, whose work is essential to the department's success. To our readers, we hope this Souvenir inspires further engagement with the critical ideas that shape our future. Finally, to the press's proprietor and staff, we thank you for your technical expertise and assistance in bringing this Souvenir to print. The timely production of this publication is a testament to your professionalism and dedication.

While we have strived to produce a high-quality publication, we humbly acknowledge that mistakes may remain within these pages. Any such errors are entirely our own, and we accept them with the intention of learning and improving for future endeavors.

In closing, this Souvenir is more than just a collection of academic reflections; it is a celebration of philosophy's vital role in our lives and its potential to contribute to a more thoughtful, just society. I hope it serves as an inspiration for all who read it, encouraging further philosophical exploration, critical thinking, and moral engagement with the world around us.

Happy World Philosophy Day!

[Dr. Kazi A S M Nurul Huda]

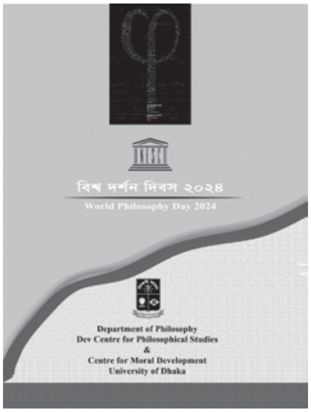

সূচিপত্র

বাংলাদেশে ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানের দর্শন: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি — ১৩
আ খ ম ইউনুস

Understanding Historical Materialism as a Scientific Theory of Society — ২৭
Haroon Rashid

ছোটদের নৈতিক শিক্ষা — ৩৩
মো. নূরুজ্জামান

‘সভ্যতাগতভাবে’ রূপান্তরিত রাষ্ট্র: দায় ও দরদের সন্ধানে — ৪১
কাজী এ এস এম নুরুল হুদা

মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্ব — ৪৫
মুর্শিদা রহমান

Examining Modern Methods of Self-Discovery via the Lens of Sophie’s World: Exploring Identity in the Digital Age — ৫০
Jannatul Ferdous Mita

স্মৃতিতে চির ভাস্বর, চির অম্লান — ৫৩

ফিরে দেখা — ৫৪

বাংলাদেশে ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানের দর্শনঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

আ খ ম ইউনুস*

প্রাককথন

বাংলাদেশে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ আগস্ট একটি গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। এটি ইসলামী বিপ্লব নয় বা ইসলামের নামে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থান নয়। এটি বাংলাদেশের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের দ্বারা সংঘটিত অভ্যুত্থান। এ গণঅভ্যুত্থানের পশ্চাতে কী দর্শন কার্যকর রয়েছে এবং এটি ইসলাম সমর্থন করে কিনা বা ইসলামের বিধি-বিধান ও নীতিপদ্ধতির সাথে এর সাযুজ্য আছে কিনা ইত্যাদি বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে।

গণঅভ্যুত্থান কী

গণঅভ্যুত্থান মানেই Public disapproval। সরকারের প্রতি সর্বসাধারণের অনাস্থার চূড়ান্ত প্রকাশ। সরকারের অন্যায়-অবিচার, যুলুম-নির্যাতন, স্বেচ্ছাচারিতা, গণতন্ত্রহীনতা, মানবাধিকারের ভূলুণ্ঠন, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, অনিয়ম-দুর্নীতি-দুঃশাসন, স্বৈরচারিতা, কর্তৃত্ববাদীতা, একনায়কত্ব ইত্যাদির প্রতিবাদে জনগণের বিদ্রোহের চূড়ান্ত পর্যায়ে যখন কোন শাসক ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, তখন এটি গণঅভ্যুত্থান বলে আখ্যায়িত হয়। এককথায়, গণঅভ্যুত্থান হচ্ছে জনগণের সংঘবদ্ধ উত্থান। এ রকম গণঅভ্যুত্থানে গত ১০০ বছরের কম সময়ে পতন হওয়া সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে ইরাকের আটবারের প্রধানমন্ত্রী নূর ই পাশা সাইদ (১৮৮৪-১৯৫৮), লিবিয়ার প্রধানমন্ত্রী কর্নেল মোহাম্মদ গাদ্দাফী (১৯৪২-২০১১), মিশরের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ হোসনি মোবারক (১৯২৮-২০২০), ইরানের বাদশাহ রেজা শাহ পাহলভী (১৮৭৪-১৯৪৪), পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইউব খান (১৯০৭–১৯৭৪), বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ (১৯০৩-২০১৯) এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (১৯৪৭ –) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীন বাংলাদেশের কয়েকজন শাসক

বাংলাদেশের জনগণ ১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দুইবার গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছে। এর আগে এই বাংলাদেশের জনগণই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬৯ সালে আরেকটি গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি করেছিল। অর্থাৎ ছয় দশকের মধ্যে এ জনপদের জনগণ তিনবার গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে ভিন্ন ভাষা ও ভিন্ন অঞ্চলের শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও বিদ্রোহ করতে হয়েছে। সর্বশেষ ঐ ভিন দেশের শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করে এ দেশটিকে স্বাধীন করা হয়েছে। প্রচুর জান-মালের ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে এ জনপদের মানবগোষ্ঠী হাফ ছেড়ে বেঁচে ছিল। গিলে ছিল তৃপ্তির ঢেঁকুর। এখন আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের নাগরিক। পেয়েছি সংবিধান। এদেশের রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদেরা জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্পিরিট সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার ইত্যাদির ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা করবেন। প্রতিষ্ঠিত হবে ন্যায়পরতা, দূর হবে দুর্নীতি-দুরাচার, অনাচার, অবিচার ও দুঃশাসন। কিন্তু রাজনীতির গতিপথ ও রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি সবসময় সুচারুরূপে সাধিত হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী একটি বৃহৎ দল দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত

* অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পরিচালক, নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ইমেইলঃ *yunusakm@gmail.com*

হল। এরপর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের মানুষ তৎকালীন রাষ্ট্রপতিকে সপরিবারে নিহত হতে দেখল। এ দেশের মানুষ এরপর একটি সেনাঅভ্যুত্থান এবং পাল্টা সেনাঅভ্যুত্থান প্রত্যক্ষ করল। এরপর রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এ এস এম সায়েমকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, পরে ১৯৭৬ সালের ৩০ নভেম্বর থেকে জেনারেল জিয়াকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে পেল। পরের বছর ২১ এপ্রিল বিচারপতি সায়েমের স্থলে জেনারেল জিয়া রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেন। ক্ষমতায় থেকে তিনি বাংলাদেশে একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। এরপর ১৯৮১ সালের ২৪ মার্চ বাংলাদেশের জনগণ আরেকটি সেনাঅভ্যুত্থান প্রত্যক্ষ করল। এ সেনা অভ্যুত্থানের নায়ক ছিলেন তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ। জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। তিনি দীর্ঘ ৯ বছর নানা কৌশলে শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। বাংলাদেশের সকল বিরোধী দল এবং ছাত্র-জনতা সম্মিলিত আন্দোলনের মাধ্যমে একটি গণঅভ্যুত্থান ঘটায়। এর ফলে স্বৈরাচারী এরশাদ ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর তিন জোটের রূপরেখার ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে কয়েকটি গ্রহণযোগ্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালে। ভূমিধ্বস বিজয় পেয়ে সরকার গঠন করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। প্রধানমন্ত্রী হন ঐ দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা নানা কূটকৌশলে দীর্ঘ সময় ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখতে চান। এর প্রথম সাংবিধানিক পদক্ষেপ হিসেবে তিনি সংবিধান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করেন। এরপর তিনি ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালে (৭ জানুয়ারি) মহা বিতর্কিত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন করে পরপর চারবার প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন থাকেন। ছাত্র-জনতার রোষানলে পড়ে এ বছরের ৫ আগস্ট ক্ষমতা ছেড়ে দেশ থেকে পালাতে বাধ্য হন। এই ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার সাড়ে ১৫ বছরের অপশাসনের অবসান ঘটে। এরপর ৮ আগস্ট জগৎখ্যাত নোবেল বিজয়ী ড. মো: ইউনুসের নেতৃত্বে একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। এ সরকার বর্তমানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করছে।

২০০৮ পরবর্তী স্বৈরতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ ও আন্দোলনের ব্যাপকতা

২০২৪-এর ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থান ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক। স্বৈরাচারের জগদ্দল পাথরের ওজনটা নব্বইয়ের স্বৈরপাথরের ওজনের চেয়ে অনেকগুণ বেশী ভারী। স্বৈরাচারী এরশাদ খুন করেছিলেন মাত্র কয়েকজন ছাত্র-জনতা। আর ৫ আগস্টে বিতাড়িত ও পদত্যাগী পলাতক প্রধানমন্ত্রী জুলাই-আগস্টের মাত্র কয়েকদিনে হত্যা করেছে দেড় সহস্রাধিক ছাত্র-জনতা। বাদ যায়নি শিশু-কিশোর, দিনমজুর, নারী-পুরুষ, শ্রমিক, রিক্সাওয়ালা, ভ্যানওয়ালা এবং সবজিবিক্রেতাও। এ স্বৈরাচার মাত্র ২০-২৫ দিনে আহত ও জীবন বিপন্ন করেছে ত্রিশ সহস্রাধিক আবাল-বৃদ্ধ বণিতার। এ স্বৈরাচার সাড়ে পনের বছরের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের মানুষের জীবনকে নির্যাতনের আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধেছিল। পুরো এ ভূখণ্ডকে স্বৈরাচার এবং তার দোসরেরা আয়নাঘরে পরিণত করেছিল। কেবল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতেই নয় পাড়া-মহল্লায়ও তারা টর্চার সেল বানিয়েছিল। আবার এদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের তীব্রতাও ছিল প্রখর। (৫ আগস্ট পরবর্তী বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক পত্রিকা – *মানবজমিন*, *নয়াদিগন্ত*, *প্রথম আলো* প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।) নির্যাতনের এ নির্মমতা এবং প্রতিবাদ ও আন্দোলনের তীব্রতাকে কার্যকারণের পরিমাণগত সম্পর্ক দিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কারণের পরিমাণগত ব্যাপ্তি কার্যের পরিমাণগত প্রকৃতিকে নির্ধারণ করে। বাংলাদেশে পতিত স্বৈরাচারের সাড়ে পনের বছরের নির্যাতন, নিপীড়ন, মানবাধিকার লঙ্ঘন, গণতন্ত্রহীনতা, বিরোধী দল ও বিরোধী মত-পথের দমন, আইনসভা, বিচারালয়, নির্বাহী বিভাগ, অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র একদলীয় শাসন ও আধিপত্য গ্রাস করে রেখেছিল। এ কার্য নিরসনের জন্য সমপরিমাণের কারণ প্রয়োজন ছিল। এ কারণটিই জুলাই-

আগস্টের ছাত্র-জনতার বিদ্রোহে দানা বেঁধেছিল। এ কারণের মহা বিস্ফোরণে স্বৈরাচারের আঁকড়ে থাকা গদির পতন ঘটেছে। জন্ম নিয়েছে আরেকটি কার্য। আর সেটিই হচ্ছে ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থান। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে এ অভ্যুত্থানকে ব্যাখ্যা করা যায় এভাবে : স্বৈরাচারের সাড়ে পনের বছরের কর্তৃত্ববাদ ও একনায়কত্ব হচ্ছে নয়, ছাত্র-জনতার প্রতিবাদ, বিদ্রোহ ও মরণপণ লড়াই হচ্ছে প্রতিনয় এবং স্বৈরাচারী সরকার প্রধানের পদত্যাগ ও পলায়ন হচ্ছে সমন্বয়।

ফ্যাসিস্ট সরকারের যেসব বৈশিষ্ট্য থাকে তার সবগুলোই ৫ আগস্টের পতিত সরকারের ছিল। সে কারণে গত সাড়ে পনের বছরের সরকার এবং তাদের রাজনৈতিক দলকে ফ্যাসিস্ট বলে অভিহিত করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইটালির বেনিতো মুসোলিনি (১৮৮৩-১৯৪৫) প্রথম ফ্যাসিস্ট বলে খ্যাত। তারপর জার্মানীর অ্যাডলফ হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫) বিশ্বকুখ্যাত ফ্যাসিস্ট। তার নাৎসিবাদ ফ্যাসিবাদের একটি ভয়ংকর মূর্তরূপ। ফ্যাসিবাদ অতি জাতীয়তাবাদের একটি চরম স্বৈরাচারী ধরন। এটি সরকার এবং সামাজিক সংগঠনের একটি চরম কর্তৃত্ববাদী এবং জাতীয়তাবাদী ডানপন্থী ব্যবস্থা। এটি একটি উগ্র দৃষ্টিভঙ্গি ও তার অনুশীলন। এ ব্যবস্থায় একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী থাকেন একজন রাষ্ট্রনায়ক। তিনি স্বৈরতন্ত্রকে স্বীয় বলয়ে কেন্দ্রিভূত করেন। বিরোধী রাজনৈতিক দলের তেমন কোন স্থান এখানে থাকে না। কর্তৃত্বময় একচ্ছত্র শাসনক্ষমতাই এর মূলমন্ত্র। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়। সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে এ ব্যবস্থা একচ্ছত্র আধিপত্যের অধীনে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। (*Encyclopedia Britannica*,"Fascism") এ ব্যবস্থা গণতন্ত্র, বহুত্ববাদ, সমতাবাদ, উদারবাদ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি বিরোধী। (*International Encyclopedia of political Science*, "Fascism,") মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লরেন্স ডব্লিউ ব্রিট তাঁর "Fascism Anyone?" প্রবন্ধে ফ্যাসিবাদের ১৪টি বৈশিষ্ট্য চিত্রায়িত করেছেন। তাঁর প্রবন্ধটি ২০০৩ সালে *Free Inquiry* জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। ফ্যাসিস্টেরা জাতীয়তাবাদের জয়গান গায়। জাতীয়তাবাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রচার করে। দেশাত্মবোধক ও জাতীয়তাবাদী গান, শ্লোগান, প্রতীক ইত্যাদি ক্রমাগতভাবে ব্যবহার করে। এটা এ কারণে করে যে, তারা দেখাতে চায় যে, তারা দেশকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। তারা খাঁটি, আদি ও আসল দেশপ্রেমিক। নিজেদের স্বার্থ হাসিল ও ক্ষমতা, আধিপত্য বজায় রাখার জন্য তারা মানবাধিকার হরণ করে। এবং এর পশ্চাতে যুক্তি দেয় যে, প্রয়োজনে মানবাধিকারকে অবহেলা করা যায়। এরা সেনাবাহিনীকে মাত্রাতিরিক্ত ও অন্যায্য প্রশ্রয় ও সুবিধা দেয়। এ বাহিনীর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ ও দমন করে। কখনও প্রত্যক্ষ, আবার কখনও পরোক্ষভাবে গণমাধ্যমের ওপর হস্তক্ষেপ করে। তারা অর্থনীতি ও বাজার ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করে। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তোলে। তারা নির্বাচনের নামে প্রতারণা করে। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মডেল ও আদর্শকে তারা গ্রাহ্য করে না। নির্বাচন নির্বাচন একটি খেলা এখানে থাকে। প্রকৃত নির্বাচন উঠে যায়। নির্বাচন হয়ে যায় একটি প্রহসন মাত্র। (*Free Inquiry*, 2003) এ ব্যবস্থা ক্ষমতা ও আইনের অপপ্রয়োগে থাকে সিদ্ধহস্ত। অর্থনীতিকে করে ধ্বংস আর নিজেদের লোককে বানায় বিত্ত-বৈভব ও প্রাচুর্যের বংশ। ৫ আগস্টের পতিত সরকার এসব বৈশিষ্ট্য পটুতার সাথে ধারণ করেছিল। বরং ক্ষেত্র বিশেষে এর মাত্রা আরো বৃদ্ধি করেছে। যুলুমবাজি, নির্যাতন, দুর্নীতি, দলীয়করণ, দমন-নিপীড়ন, পেশি শক্তি এবং সরকারি, আধা সরকারি বাহিনীর অপব্যবহার স্বৈরশাসনের সকল বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করেছিল।

রাজনীতিতে মিথ্যাচারিতা, ভণিতা, প্রহসন, লৌকিকতা, অন্তসারশূন্যতা, কথা ও কাজের মিল না থাকা, এককথায় একটি মেকি কালচার, এখানে চালু হয়েছিল। আমরা দেখলাম পকেটে গুলি, হাতে পিস্তল, দেখলাম মাথায় কাপড় বাঁধা, হাতে রামদা, আর মুখে শ্লোগান – শিক্ষা সন্ত্রাস একসাথে চলবে না। শুনলাম–শিক্ষা-শান্তি, প্রগতি প্রগতি, আর দেখলাম হলে হলে টর্চার শেল, র‍্যাগিং এবং আবরার ফাহাদদের নির্মম মৃত্যু। টিভির পর্দায় এদেশের

মানুষ দেখল–লেবু আর ধানের বাম্পার ফলন। অথচ নিম্নবিত্তকে দেখা গেল প্রয়োজনীয় বাজার না করে বাসায় ফিরতে। এদেশ হয়ে গেল উচ্চবিত্তের অভিলাষ আর নিম্নবিত্তের নাভিঃশ্বাস। মুখে শোনা গেল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর মানুষ দেখল গণতন্ত্র, সাম্য ও মানবিক মর্যাদার ভূলুণ্ঠন। একজনকে হাজারবার বলতে শুনলাম, স্বজন হারানোর ব্যথা আমি বুঝি। অথচ গুম, খুন, আয়নাঘর সৃষ্টি হয়েছে তারই ক্ষমতালিপ্সা পরিতৃপ্তির জন্য। আর গুমের কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়েছে র‍্যাব, ডিজিএফআই, ডিবি, সিটিটিসি, সিআইডি, পুলিশসহ বিভিন্ন সংস্থার সদস্যদের দিয়ে। আয়নাঘরের চেয়েও ভয়াবহ আটটি গোপন বন্দিশালার সন্ধান পেয়েছে গুম সংক্রান্ত কমিশন। (গুম সংক্রান্ত কমিশন অফ ইনকোয়ারির সংবাদ সম্মেলন। *দৈনিক প্রথম আলো*, ৫ নভেম্বর, ২০২৪) সরকার ও সরকারি দলের নেতাদের নিকট থেকে এদেশের জনগণ শুনল গ্রহণযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের কথা। কিন্তু বাংলাদেশ দেখল ভোটারবিহীন নির্বাচন (২০১৪), নিশি রাতের নির্বাচন (২০১৮) এবং ডামি নির্বাচন (২০২৪)। মুখে বলতে শোনা গেল দুর্নীতির প্রতি জিরো টলারেন্স কিন্তু ভেতরে ভেতরে পাচার হয়ে গেল লক্ষ হাজার কোটি টাকা। এ সময় অবাধ লুণ্ঠনের শিকার হয়েছে ব্যাংক খাত। *দৈনিক বণিক বার্তা*র একটি রিপোর্ট অনুযায়ী লুটেরা সরকার ১৮ লাখ ৩৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ রেখে গিয়েছে, অথচ ২০০৯ সালে শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সময় এ ঋণ ছিল মাত্র ২ লাখ ৭৬ হাজার ৮৩০ কোটি টাকা। তার শাসনামলে ঋণ হয়েছে ১৭ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকার বেশি। ২০০৯ সালে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ২২ হাজার ৪৮২ কোটি টাকা আর ২০২৪ সালের মার্চে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ৮২ হাজার কোটি টাকা অতিক্রম করে। (*দৈনিক বণিক বার্তা*, ৭ আগস্ট, ২০২৪) প্রকৃত সত্য এর থেকে হয়ত আরও অনেক বেশী। কেননা সরকার অনেক তথ্য লুকিয়ে রাখতো। এর পরেতো মন্ত্রী, আমলা, পুলিশ অফিসার, রাজনীতিবিদ, ছাত্রনেতা প্রমুখের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাটের ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। কেউ কেউ নাকি টাকার জাযিমে না শু'লে ঘুমাতে পারত না। এক সময়ে সর্বহারার শাসন কায়েমের রাজনীতিবিদও না কি ২৫ হাজার কোটি টাকার উপরে মালিক বনে গিয়েছে। এ ব্যবস্থায় বিচারপতিরা হয়ে গেল "শপথবদ্ধ রাজনীতিবিদ।" ফ্যাসিবাদের অনুসারী শিক্ষিত মেধাবী ছাত্রনেতা, রাজনীতিবিদ ও আমলারা হয়ে গেল স্যুটেড-বুটেড স্মার্ট চোর-ডাকাত।

গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যম

এ গণঅভ্যুত্থানে প্রধানত দু'টি পক্ষ। এক পক্ষে রয়েছে স্বৈরাচারী সরকার, তার দল এবং দোসরেরা। অন্য পক্ষে রয়েছে এ দেশের ছাত্র-জনতা, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা। স্বৈরাচারী সরকার এবং তার দোসরদের ক্ষমতাকে আঁকড়ে রাখার এবং বিরোধী মত ও পথকে দমন করার জন্য অন্যতম পদ্ধতিগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ:

আইন ও আদালতকে ব্যবহার করা। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে আইন করে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি বাতিল করা। নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন ও তার অপপ্রয়োগের মাধ্যমে বিরোধী মত ও পথকে দমন করা। এ প্রসঙ্গে সাইবার নিরাপত্তা আইন এবং বহুল বিতর্কিত ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট (DSA) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয়ত: সাংগঠনিক ও পেশি শক্তির ব্যবহার। সরকারী দল আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবকলীগ, মহিলা লীগ বিরোধী নেতা-কর্মীদের দমনের জন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাড়া-মহল্লায় টর্চার সেল গঠন করে বিরোধী রাজনৈতিক এবং জনমানুষের জন্য ভীতিকর পরিস্থিতি বজায় রেখেছিল।

তৃতীয়ত: সরকারি-আধাসরকারি বাহিনী ও সংস্থাকে ব্যবহার করে বিরোধী রাজনীতিকে দমিয়ে রেখেছিল। বাংলাদেশ পুলিশ, বিডিআর/বিজিবি, র‍্যাব, ডিজিএফআই ইত্যাদি সংস্থাকে নিজেদের হীন স্বার্থে ব্যবহার করেছে। এদের দিয়েই আয়নাঘর বানিয়েছে। সম্প্রতি আয়নাঘরের চেয়ে ভয়ঙ্কর নির্যাতনের আটটি গোপন স্থান প্রাপ্তির খবর প্রকাশিত হয়েছে। ডিবি অফিসে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়াতো ছিল প্রায় নিত্য দিনকার ঘটনা।

চতুর্থত: জুলাই-আগস্টের ছাত্রদের যৌক্তিক দাবি সংলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে নিরসনের চেষ্টা না করে ছাত্রলীগ এবং পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে ছাত্র আন্দোলন দমনের চেষ্টা করেছে। ছাত্রলীগের হামলা এবং পুলিশের বর্বরোচিত আচরণের বিভিন্ন ছবি জুলাই-আগস্টের দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ছাত্রলীগ, যুবলীগ, মহিলালীগ সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে এ আন্দোলন নির্মূল করার চেষ্টা করেছে।

পঞ্চমত: সরকার বিটিআরসির মাধ্যমে ব্রডব্রান্ড ও মোবাইল ডাটা বেশ স্লো করে দেয় এবং একপর্যায়ে কয়েকদিনের জন্য বন্ধ করে দেয় যাতে আন্দোলনকারীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।

ষষ্ঠত: সরকার সারা দেশে কারফিউ আরোপ করে যাতে আন্দোলনের জন্য ছাত্র-জনতা একত্রিত ও সংঘবদ্ধ না হতে পারে।

সপ্তমত: স্বৈরাচারী সরকার আন্দোলন দমাতে বিদেশী শক্তি ব্যবহারেও পটুতা দেখিয়েছে। আন্দোলন দমাতে নেমে পড়া পুলিশ ও আর্মির গাড়ি বহরে UN স্টীকারযুক্ত গাড়ি দেখা গেছে। এটি আন্দোলনকারীদের বিভ্রান্ত করতে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে জার্মানীর বন ভিত্তিক একটি ম্যাগাজিন *The Mirror Asia*-এ বিদেশী শক্তির ব্যবহারের একটি ভয়ানক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। শেখ হাসিনা এবং ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এর অনুরোধে ভারতের Research and Analysis Wing (R&AW)-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৪০০ কর্মকর্তা প্রতিবাদকারী ছাত্রদের বিরুদ্ধে একটি শক্তি হিসেবে কাজে লাগাতে ১৬ জুলাই থেকে ঢাকাতে নিয়োজিত হয়েছিল। এই রিপোর্ট অনুসারে এই কর্মকর্তাবৃন্দকে কাশ্মিরে আন্দোলন দমনের অনুরূপ উপায় অবলম্বন করে ছাত্র আন্দোলন দমন করতে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ২৮ জুলাই এ কর্মকর্তাবৃন্দ দিল্লীতে ফিরে যায়। (*The Mirror Asia*, September 1, 2024)

অষ্টমত: বিরোধী মতের লোকদেরকে জঙ্গীসহ নানা ট্যাগ লাগিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মাধ্যম

এ দেশের বিরোধী দলগুলো ২০০৯ সালের পর থেকেই আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছে। বিশেষ করে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি বাতিল, দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন, প্রহসনের নির্বাচন, গুম-খুন, জেল-যুলুম ইত্যাদির বিরুদ্ধে মানববন্ধন, বিক্ষোভ সমাবেশ, মিছিল, হরতাল, অবরোধ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করছে। যদিও সরকারের দমন-পীড়নের কারণে তা সরকার বিরোধী জোরালো আন্দোলনে পরিণত হতে পারেনি।

২০১৮ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের নেতৃত্বে সরকারি চাকুরীতে কোটা প্রথা সংস্কারের দাবিতে একটি আন্দোলন চাঙ্গা হয়। লাগাতার আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর সরকারি ১ম ও ২য় শ্রেণির চাকুরীতে কোটা-পদ্ধতির বিলোপ সাধন করে। এবং সরকার যথারীতি প্রজ্ঞাপন জারি করে। এর ফলশ্রুতিতে ছাত্রেরা আন্দোলন প্রত্যাহার করে।

কিন্তু বিধিবাম। ২০২৪ সালের ৫ জুন হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ ২০১৮ সালের কোটা বাতিলের প্রজ্ঞাপনটি বাতিল করে রায় দেয় এবং কোটা পুনরায় বহাল করে। এতে ছাত্র এবং সরকারি চাকুরী প্রত্যাশীরা পুনরায় বিক্ষুব্ধ হয়। তারা প্রথম পর্যায়ে সারাদেশে “বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন” ব্যানারে ৩০ জুন থেকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করে। ১৪ জুলাই থেকে আন্দোলন ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। ১৪ জুলাই ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশে আন্দোলনকারীদের উপর রড, লাঠি, হকিস্টিক, রামদা, আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হামলা করে। পুলিশও লাঠিচার্জ, টিয়ারশেল নিক্ষেপ এবং রাবার বুলেট, গুলি ইত্যাদি দিয়ে হামলা করে। ১৬ জুলাই রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদসহ ছয়জন মৃত্যুবরণ করে। আন্দোলন জোরদার হল। এ আন্দোলনে স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসহ এ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যুক্ত হতে থাকে। সরকারি বিভিন্ন বাহিনী ও শাসক দলের নির্মমতাও বাড়তে থাকে। আর প্রত্যেক দিন বাড়ে নিহত ও আহতের সংখ্যা। পরিশেষে ছাত্র-জনতার সর্বব্যাপী প্রতিবাদের মুখে ৫ আগস্ট ২০২৪ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগে বাধ্য হয় এবং পলায়ন করে প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতা নিম্নোক্ত মাধ্যমগুলো অবলম্বন করে।

সারাদেশে বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ এবং অবস্থান ধর্মঘট। বাংলা ব্লকেড, (৭ জুলাই) অবস্থান ধর্মঘট এবং প্রেসিডেন্টের নিকট স্মারকলিপি প্রদান (১৪ জুলাই), কমপ্লিট শাটডাউন (১৮-১৯ জুলাই), সারাদেশে বৃহদাকারে বিক্ষোভ প্রদর্শন (২৯ জুলাই), আওয়ামী লীগ কর্তৃক মৃতদের জন্য শোক প্রকাশ কর্মসূচি প্রত্যাখ্যান এবং আওয়ামী লীগ কর্তৃক ফেইসবুক প্রোফাইল কালো রঙ করার প্রতিবাদে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার ফেইসবুক প্রোফাইল লাল রঙ করা (৩০ জুলাই), মার্চ ফর জাস্টিস (৩১ জুলাই), রিমেমবারিং দ্যা হিরোস (৩২ জুলাই=পহেলা আগস্ট), নয় দফা দাবি প্রকাশ (৩৩ জুলাই=২আগস্ট), অসহযোগ আন্দোলন (৩৪ জুলাই=৩ আগস্ট), ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান ধর্মঘট এবং শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবীতে একদফা ঘোষণা (৩৫ জুলাই=৪ আগস্ট), মার্চ টু ঢাকা (৩৬ জুলাই=৫ আগস্ট) এবং এর মধ্য দিয়ে সফল হয় গণঅভ্যুত্থান।

গণঅভ্যুত্থানের দর্শন

২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণমানুষের দর্শন ফুটে উঠেছে। এ দেশের সমাজ ও রাজনীতি কেমন হওয়া উচিত তা এদেশের ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে চিত্রায়িত হয়েছে। এ দর্শন অন্যায়-অত্যাচার, নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দর্শন। এ দর্শন বৈষম্য ও শোষণহীন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দর্শন। এ দর্শন স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার রাজপথের শ্লোগান ও দেয়ালের গ্রাফিতির মধ্যে। এ শ্লোগান ও দেয়ালের গ্রাফিতি এ দেশের ছাত্র-জনতার হৃদয়ের ভাষা, বুদ্ধিদীপ্ত উপলব্ধি, পথচলার প্রভাময় আলোকচ্ছটা। কতিপয় শ্লোগানের প্রতি নজর বুলানো যাক।

আমার সোনার বাংলায় – বৈষম্যের ঠাঁই নাই।
কোটা একটা ভিক্ষা, মুক্তি পাক শিক্ষা।
কোটা না মেধা – মেধা মেধা।
আর ন হাইয়্যে – বৌত দিন হাইয়্যে (আর খেয়োনা; বহুত দিন খেয়েছ)।
রক্তের বন্যায় – ভেসে যাবে অন্যায়।
জেগেছেরে জেগেছে – ছাত্র সমাজ জেগেছে।
লেগেছেরে লেগেছে – রক্তে আগুন লেগেছে।

ক্ষমতা না জনতা– জনতা জনতা।
আমার টাকায় খায় পরে – আমার গায়ে গুলি করে।
দালালী না রাজপথ – রাজপথ রাজপথ।
আপোষ না সংগ্রাম –সংগ্রাম সংগ্রাম।
বুকের ভেতর অনেক ঝড় – বুক পেতেছি গুলি কর।

এসব শ্লোগানের মধ্যে দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত হয়েছে বৈষম্যের বিপরীতে সমতার প্রতি অঙ্গীকার এবং সুযোগের সমতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। একই সাথে প্রকাশিত হয়েছে আত্মমর্যাদাবোধ, ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা, যোগ্যতার কদর এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে টিকে থাকার অদম্য স্পৃহা। এ স্পৃহা কেবল নিজেদের মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতাকেই প্রতিষ্ঠিত করে না বরং প্রতিদ্বন্দ্বীর মেধা ও যোগ্যতাকেও সম্মান প্রদর্শন করে। এ স্পৃহা প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তিকে বিকশিত করে। যোগ্যতম হওয়ার দীক্ষা দেয়। মেধা ও যোগ্যতার নীতিকে অগ্রাধিকার দেয়া নিঃসন্দেহে দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর। ছাত্রদের মেধার নীতি দেশের অগ্রগতিকে শাণিত করার তাৎপর্য বহন করে।

মেধার অবনমন, যোগ্যতা প্রমাণের পরও বিপুল সংখ্যক কোটার নিকট চাকুরী প্রত্যাশীদের হেরে যাওয়া এতটা অপমানিত করেছে যে তারা বুক পেতে গুলি খেতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। দালালী ও আপোষকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে সংগ্রামকে স্বাগত জানিয়েছে। এ সংগ্রাম তাদেরকে নির্ভীক বানিয়েছে। পরাক্রমশালী সরকারি বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন, গুলি ও জেল-যুলুমের ভয় থোরাই কেয়ার করেছে। মৃত্যুকে সংবর্ধিত করার জন্যই যেন ওরা প্রস্তুত ছিল অহর্নিশ। এ যেন কাজী নজরুলের – শির দেগা, নেহি দেগা 'আমামা। তাইতো তাদের বজ্রকণ্ঠে সমুচ্চারিত ধ্বনি "রক্তের বন্যায় – ভেসে যাবে অন্যায়।" সত্যিই দেড় সহস্রাধিক শিশু-কিশোর এবং নারী-পুরুষের জীবনপাতের এবং প্রায় ত্রিশ সহস্রের আহতের রক্তস্রোত স্বৈরাচারের তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ সিংহাসন কৃষ্ণসিস কয়লা হয়ে মাটিতে লুটিয়েছে লজ্জাবতীর অবগুণ্ঠিত বদনে। এ হচ্ছে সত্যের কাছে মিথ্যার, নৈতিকতার কাছে দম্ভের, সাহসের কাছে পরাক্রমশীলতার, নিরস্ত্র জনতার কাছে সশস্ত্র সজ্জিত বাহিনী ও পেশি শক্তির, যৌক্তিক দাবির নিকট নিষ্ঠুরতা-নির্মমতার, করুণিমা মস্তকে প্রতাপশালীর অসহায় পরাজয় ও পলায়ন।

গণঅভ্যুত্থানে দেয়ালের গ্রাফিতিতে আরো স্পষ্ট হয়েছে এ দেশের গণমানুষের দর্শন। গ্রাফিতির কিছু উক্তি বিবেচনা করা যাক।

দেয়ালে দেয়ালে লেখা – Motherland or Death.
খাঁচার ভেতর বদ্ধ পাখির ছবির পাশে লেখা রয়েছে – Why are you in the cage? পাখির উত্তর – I speak.
ছাত্রদের স্যালুটরত একজন রিক্সাওয়ালা। পাশে লেখা রয়েছে – আপনি অসাধারণ, স্যালুট আপনাকে – আপনি স্বৈরাচার নন।
বন্দুক দিয়ে গুলি করা দ্বিখণ্ডিত মস্তকের ছবি – পাশে লেখা রয়েছে উপরের নির্দেশ।
স্বৈরাচারের ছলনাকে ব্যঙ্গ করে লেখা হয়েছে – নাটক কম কর পিও।
নাঙ্গা মগজ – তাতে আঁকা রয়েছে লাল-সবুজের পতাকা।
সিংহের ছবি একে পাশে লেখা রয়েছে – Hunt Victory।

খাঁচা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে পাখি, স্বাধীন আকাশে উড়ার প্রবল ইচ্ছার কাছে মুছে গেছে পরাধীধনতার বাধা। পাশে লেখা রয়েছে – এ আকাশ আমাদের।

দফা ১ দাবি ১ – Loud and clear।

চলো বাংলাদেশ – চলো বিজয়ের টানে।

GEN Z – দাবায়া রাখতে পারবা না।

We are one.

Fight for your right.

দেয়ালে আঁকা রয়েছে মুসলিমদের কালিমার ক্যালিগ্রাফি, রয়েছে আরো কিছু আরবী ও বাংলা ক্যালিগ্রাফি।

রাস্তায় যানজটের ছবি এঁকে লেখা রয়েছে – একজন ভিআইপির জন্য পৃথিবী থেমে থাকতে পারে না।

কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার দ্রোহ ও সাম্যের কিছু পংক্তি লেখা রয়েছে –

কারার ঐ লৌহ কপাট,
মোরা ঝঞ্জার মত উদ্দাম,
গাহি সাম্যের গান – ইত্যাদি।

লেখা রয়েছে – চেয়ে দেখ এই চোখের আগুন – এই ফাগুনেই হবো আমরা দ্বিগুণ।

ধর্ম যার যার – দেশ সবার।

আমরা আম জনতা – কম বুঝি ক্ষমতা।

দুর্নীতি করব শেষ – সবাই মিলে গড়ব দেশ।

রক্ত দিয়ে বানাইছি ঘর – দিল্লি দেখায় পানির ডর।

এসব গ্রাফিতিতে একদিকে যেমন স্বৈরাচারের প্রতি ক্ষোভ, দ্রোহ, ঘৃণা, প্রতিবাদ ইত্যাদির প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে দেশপ্রেম, অধিকার রক্ষা, দেশ গড়ার প্রত্যয়, শোষণ ও দুর্নীতির গ্রাস থেকে দেশ মুক্ত করার অঙ্গীকার দৃঢ়তার সাথে প্রতিভাত হয়েছে। এ হচ্ছে স্বাধীনতার দর্শন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের দর্শন। দুর্নীতি ও স্বৈরচারিতার শোষণ ও নির্মম-নিষ্ঠুর একদলীয় নিপীড়ন থেকে মুক্তির দর্শন। এ মুক্তির দর্শনই ছাত্র-জনতাকে জীবন বাজি রাখতে প্রেরণা যুগিয়েছে। এ দর্শনই নির্ভিকতার রক্তস্রোত শাণিত করেছে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার শিরায় শিরায়। এ কারণেই পুলিশ অফিসারকে স্বৈরাচারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট আতঙ্কের বাণী বলতে শুনি "স্যার, গুলি করি, মরে একটা, যায় একটা।" নির্ভিকতা ও মুক্তির উন্মত্ততার দর্শনই স্বৈরাচারের সিংহাসনকে অতল গহীনে নিমজ্জিত করতে সক্ষম হয়েছে।

২০২৪ সালের গণঅভুত্থানের দর্শন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের দর্শন থেকে ভিন্ন কিছু নয়। এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ভিন্ন অঞ্চলের শাসকদের শোষণ, অপশাসন, দুঃশাসন, বৈষম্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে আর ২০২৪ সালে সংগ্রাম করতে হয়েছে এ দেশীয় শাসকগোষ্ঠির অপশাসন, দুঃশাসন, নির্যাতন-নিপীড়ন, অপরাজনীতি ও একদলীয় রাজত্ব কায়েমের বিরুদ্ধে। আরো পরিতাপের বিষয় যে, এ সংগ্রাম করতে হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী একটি বৃহৎ দলের বিরুদ্ধে।

দেয়ালের এ গ্রাফিতি অংকনে কেবল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অংশগ্রহণ করেছে, তা নয়। স্কুলের কিশোর-কিশোরীদের উদ্যোগ ও উদ্দাম ছিল খুবই ব্যাপক। রাজপথে, মিছিলে, দেয়ালের গ্রাফিতি অংকনে এ দেশের

সিংহ শার্দূল দামাল ছেলেদের পাশাপাশি স্কুল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরাও বিক্ষোভে বাঘিনীর ক্ষীপ্রতায় আর দেশ গড়ার প্রত্যয়ে মাতৃত্বের মমতায় নিজেদেরকে প্রকাশ ঘটিয়েছে অত্যন্ত সফলতার সাথে।

১৯৭১ সালের মুক্তি-সংগ্রামের মূল দর্শন ছিল গণতন্ত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা। পাকিস্তানী অপশাসন-দুঃশাসন ও বৈষম্যের যাতাকলে আমরা ছিলাম ২৩ বছর। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে *ডাবল* ২৩ পার করে আমরা ৫৩ বছর অতিবাহিত করছি। এত বছরেও আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। এ দেশে গণতন্ত্র হোঁচট খেয়েছে বারবার। স্বাধীনতা লাভের ঠিক ২০ বছর পর এ দেশের ছাত্র-জনতা ১৯৯০ সালে আন্দোলন-সংগ্রাম করে দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিল এ দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের দর্শন ও চেতনা থেকে বিচ্যুতিতে অপশাসন, দুঃশাসন, বৈষম্য ও গণতন্ত্রহীনতায় স্বৈরশাসক নোঙর গেড়েছে। ছাত্র-জনতা রাজপথে রক্ত দিয়ে একটি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করল। এ দেশের মানুষ পুনরায় আশায় বুক বাঁধল যে এবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ অগ্রগতি-প্রগতির দিকে ধাবিত হবে। না, হলো না সেটি। কয়েকবছর দেশবাসী তিন জোটের রূপরেখার ভিত্তিতে নির্বাচন ও সরকার গঠন প্রক্রিয়া দেখল। কিন্তু ২০০৮ সালের পর দেশবাসী দেখল আরেক ভয়াবহ স্বৈরাচার। এ দেশের ছাত্র-জনতা ৯০ গণঅভ্যুত্থানের ৩৩ বছর পর রাজপথে রক্তস্রোতে জীবন ভাসিয়ে দেশবাসীকে আবার দেখিয়ে দিল এবারের মুক্তিযুদ্ধের দর্শন ও চেতনার প্রতি আঘাত আরো বেশি ব্যাপক, প্রবল ও ক্ষুরধার। এদের নোঙর আরো বেশি গভীরে। এ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মুক্তির দর্শনে তাড়িত হয়ে ৫ আগস্ট আরেকটি গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত করল। এবারও স্বাধীনতা, মুক্তি, বৈষম্যহীনতা, মানবিক মর্যাদা, ন্যায়বিচার এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে কি?

১৯৭১ সালের মুক্তি সংগ্রামের অগ্রণী ভূমিকা আর ৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে যে দলটি ২য় প্রধান দল হিসেবে ভূমিকা রেখেছে, সে দলটিই ২৪ এ স্বৈরাচারের খেতাব নিয়ে, জননিন্দিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছে। এ থেকে এ দর্শনটি আমরা পাই যে, অন্যায়-অপকর্ম, দুঃশাসন, দুর্নীতি, নির্যাতন-নিপীড়ন, কূট-কৌশল, মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি স্বগতভাবেই ক্ষয়িষ্ণু। কাঁচের ন্যায় ভঙ্গুরতার প্রবণতা এর মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। এর স্থায়িত্ব নেই। এর ক্ষয়িষ্ণু প্রবণতা এর মধ্যে ধ্বস নামাবেই। এরই স্পষ্ট উচ্চারণ রয়েছে আল কুরআনে: “জাআল হাক্কু...কানা যাহুকা।” অর্থাৎ সত্য এসেছে, বাতিল ধ্বংস হয়েছে। নিশ্চয় বাতিল ধ্বংস হওয়ারই বস্তু। (আল কুরআন, ১৭:৮১) এ দর্শন নিঃসন্দেহে এ দেশের মানুষের উপলব্ধিকে তীক্ষ্ণ করবে বলে আশা করা যায়।

শাসকশ্রেণী জনগণের খাদেম। জনগণ হচ্ছে মালিক। জনগণই ক্ষমতার উৎস। এটিই প্রচলিত গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র। জনগণের সাথে বাহানা করা, ছলনা ও প্রহসন করা, অবজ্ঞা করা, জনগণের সাথে বৈষম্যের নীতি অবলম্বন করা নিতান্তই অন্যায়। স্বজনপ্রীতি করা, স্বীয় দল ও গোষ্ঠির লোককে অন্যায্য সুবিধা দেওয়া, যোগ্যতার মূল্যায়ন না করা, কূট-কৌশল অবলম্বন করা ইত্যাদি মহাঅন্যায়। এ অন্যায় এ দেশের মানুষ সহ্য করে না। এর প্রতিবাদ করে, বিচার করে, প্রতিশোধ নেয়। পুঞ্জিভূত প্রতিশোধস্পৃহা জনতার সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় মহা বিস্ফোরণ ঘটায়। অন্যায়-অপশাসন, নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে এ মহাবিস্ফোরণের দর্শন লুক্কায়িত রয়েছে জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে।

২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান গণতন্ত্রের নামে একদলীয় একচ্ছত্র অপশাসনের ক্ষতিকর দিককে সুস্পষ্ট করে। এ অভ্যুত্থান বহুদলীয় রাজনীতি, আইনের শাসন ও জবাবদিহিতা এবং গণতান্ত্রিক শাসন ও স্বচ্ছ নির্বাচন ব্যবস্থাকে

নির্দেশ করে। প্রহসনের নির্বাচন, মিথ্যা প্রচার, উন্নয়নের গল্প, পেশি শক্তির বড় সংগঠন এবং বিদেশি সংস্থা ও সরকারের প্রতি আনুগত্য সরকারকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে ক্ষমতায় আসীন রাখতে পারে ইত্যাদির অসারতাকে প্রমাণ করে।

২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান সাধারণ জনগণের পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মের প্রতি দায়বদ্ধতার দর্শন। তরুণ প্রজন্মের চিন্তা- চেতনা, মন-মনন, চাহিদা ও প্রয়োজন উপলব্ধির আবশ্যকতাকে নির্দেশ করে। তরুণ প্রজন্মকে উপেক্ষা না করে তাদের দাবি ও যুক্তিকে আমলে নেওয়া, দমনের অপচেষ্টা না করে সংলাপ ও আলোচনার গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি অনুসরণের গুরুত্বকে সমহিমায় উদ্ভাসিত করে। এ অভ্যুত্থান শাসকগোষ্ঠির আত্মম্ভরিতা, নিজেদেরকে উচ্চাসনে আসীন, ক্ষমতার মোহে অন্ধ থাকা, সরকারি প্রটোকলে রাজকীয় জৌলুস জনরোষে ধূলায় ও বাষ্পে বিলীন হতে পারে – গণতন্ত্রের এ দীক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

গণঅভ্যুত্থানে জনগণের অন্দোলন-সংগ্রাম ও বিদ্রোহের ফলে শাসকগোষ্ঠি পদত্যাগ করে অথবা পলায়ন করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট জনগণের এরূপ বিদ্রোহেরই প্রতিফলন ঘটেছে। স্বৈরশাসকের পলায়নের পশ্চাতে জনরোষ এবং দেশের ছাত্র-জনতার সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। জনগণের এ বিদ্রোহ এবং শাসকশ্রেণিকে পদত্যাগ বা পলায়ন করতে বাধ্য করা ইসলাম সমর্থন বা অনুমোদন করে কি না, এ অনুচ্ছেদে তা বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এদেশের ৯২% লোক মুসলিম। তবে এটি ইসলামী রাষ্ট্র নয়। সাংবিধানিক ভাষায় এটি “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।” ইসলামী বিধান মতে এর শাসক নির্বাচিত বা মনোনীত হয় না। ইসলামী বিধান মতে, সারা বিশ্বের সমস্ত মুসলিম একটি উম্মাহ। এই উম্মাহ এবং এর দেশগুলো একটি খেলাফতের অধীনে পরিচালিত হবে। মুসলিম উম্মাহর একজন মাত্র খলিফা বা আমিরুল মু’মিনীন থাকবে। আমিরুল মু’মিনীন নির্বাচিত হবেন বিশিষ্ট মুত্তাকীন নেতৃবৃন্দের পরামর্শের ভিত্তিতে অথবা বিদায়ী খলিফার ওসিয়তের ভিত্তিতে। বাংলাদেশ এ ধরনের খেলাফত ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত কোন রাষ্ট্র নয়। অতএব এর শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা শাসককে অপসারণের ব্যাপারে ইসলামী বিধান অন্বেষণ করা কি অবান্তর? বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এর একটি সরকার এবং শাসক আছে। এ শাসক নির্ধারিত মেয়াদের আগে প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি অবলম্বন ব্যতীত অপসারণ করা বৈধ কি? এসব প্রশ্ন করাই যায়। আবার যেহেতু এটি মুসলিম প্রধান দেশ, সেহেতু ইসলাম সরকারের অপসারণ সমর্থন করে কিনা – সে প্রশ্নও অস্বাভাবিক নয়।

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। এ দেশের সরকার গঠিত হয় প্রচলিত পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের রীতিনীতি অনুসারে। বাংলাদেশের সরকার গঠনে এ রীতিনীতিও গত ৫৩ বছরে কয়েকবার ভয়ানকভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। বিশেষ করে ৫ আগস্টের পতিত সরকার ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪-এ প্রহসন ও কূটকৌশলের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছিল। তারা সততা, স্বচ্ছতা এবং নিষ্ঠার সাথে দেশের শাসনকার্য নির্বাহের জন্য নিয়োজিত হয়েছিল তা নয়; বরং তারা রাষ্ট্রের দখলদারিত্ব করায়ত্ত করে লুটতরাজ, অর্থআত্মসাৎ ও দুর্নীতির মাধ্যমে বিত্ত-বৈভব ও প্রাচুর্যের মালিক হওয়াকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পরিণত করেছিল। আর এটা করতে গিয়ে তারা আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের রন্ধ্রে রন্ধ্রে একদলীয় একচ্ছত্র শাসন ও অধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ভূলুণ্ঠিত করেছিল মানবাধিকার। আইনের শাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছিল। আর রাষ্ট্রের মালিক জনগণকে থোরাই কেয়ার করেছিল। গণতান্ত্রিক অধিকার এবং নির্বাচন

ব্যবস্থাকে পাঠিয়েছিল নির্বাসনে। জনগণকে তোয়াক্কা না করে দলীয় ও রাষ্ট্রীয় শক্তি দিয়ে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করেছিল। তাদের অপশাসন-দুঃশাসন, অত্যাচার-নিপীড়ন, দুর্নীতি ও গণতন্ত্রহীনতার বিরুদ্ধে এ দেশের জনগণের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ জুলাই-আগস্টের মহাবিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ছাত্র-জনতার বিদ্রোহের মাধ্যমে। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এ গণবিদ্রোহ বৈধ, যুক্তিযুক্ত এবং খুবই স্বাভাবিক।

শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রসঙ্গে এবার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা যাক। মুসলিম ধর্মবেত্তা এবং ধর্মতাত্ত্বিকদের মতে এ প্রসঙ্গে দু'টি ভিন্ন মত পাওয়া যায়। একটি মত অনুসারে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অবৈধ এবং অন্যায়। এদের কেউ কেউ বিদ্রোহকে গুনাহ বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আরেকটি মত অনুসারে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আবশ্যক (ওয়াজিব), বৈধ এবং ন্যায়সঙ্গত।

শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অবৈধ এবং অন্যায় – এ মতের পক্ষে রয়েছে হানাফী স্কলারবৃন্দ। হানাফীদের মতে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা পাপ। (Fadl, Khaled Abou EL, *Rebellion and Violence in Islamic Law*, Cambridge University Press, 2001, p. 238) তাঁদের এ মতের পক্ষে তাঁরা আল কুরআন এবং হাদীসের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে থাকেন। আল কুরআনে আল্লাহ বলেন, "ইয়া আয়্যুহাল্লাজিনা আমানু ... ওয়া উলিল আমরু মিনকুম" অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তোমাদের মধ্যে নির্দেশদাতা তথা শাসকদের আনুগত্য কর। (আল কুরআন, ৪:৫৯) এ আয়াতের মর্মানুসারে শাসকদের নির্দেশ পালনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। একটি হাদীসে নবী মুহাম্মদ (স.) বলেন, "মনে রেখ, তোমাদের জন্য যে শাসনকর্তা নিয়োজিত হয়েছে, তাকে যদি তোমরা আল্লাহর অবাধ্য হতে দেখ তাহলে সে শাসককে ঘৃণা করবে, কিন্তু তার থেকে তোমাদের আনুগত্যের হাত প্রত্যাহর করবে না।" (*Sahih Muslim*, Book on rularship, no. 1855)

আরেকটি হাদীসে নবী (স.) বলেন, "তোমাদের মধ্যে যদি কেউ শাসকের আনুগত্য পরিহার করে এবং মুসলিম জামা'আতবদ্ধতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আর এ অবস্থায় যদি সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে আইয়্যামে জাহেলিয়ার বৈশিষ্ট্য নিয়ে অর্থাৎ একজন অমুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে।" (*Sahih Muslim*, Book on rularship, no. 1848; Al-Nasa'i, *Sunan*, Book on sanctity of blood, no. 4114)

দ্বিতীয় মত অনুসারে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অন্যায় এবং গুনাহের কাজ নয়। এ মতের পক্ষে রয়েছেন হাম্বলী, মালেকী এবং শাফেঈ মাযহাবের ধর্মতাত্ত্বিকবৃন্দ। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.)ও এ মত পোষণ করেন। তারা নিজেদের মতের পক্ষে আল কুরআন এবং হাদীসের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন।

আল কুরআনে আল্লাহ বলেন, "ওয়ামা লাকুম লা তুকাতিলুনা... মিল্লাদুনকা নাছিরা" অর্থাৎ তোমাদের এ কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সেসব অসহায় নর-নারী ও শিশু সন্তানদের (বাঁচাবার) জন্য লড়াই করো না? অথচ তারা এই বলে ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব, জালেমদের এই জনপদ থেকে তুমি আমাদের বের করে নাও। আর তুমি আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। (আল কুরআন, ৪:৭৫) অন্য আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন, "ওয়া লা তারকানু ইলাল্লাজিনা... সুম্মা লা তুনছারুন" অর্থাৎ তোমরা তাদের দিকে ঝুঁকবে না (সমর্থন, অনুমোদন ও সহযোগিতা করে) যারা যুলুম করেছে। তাহলে জাহান্নামের আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে। (মনে রেখ) আল্লাহ ব্যতিত তোমাদের আর কোন অভিভাবক নেই। আর তোমাদের কোন সাহায্যও করা হবে না। (আল কুরআন, ১১:১১৩)

শাসকদের অমান্যতা, অবাধ্যতা এবং তাদের অন্যায় ও যুলুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পক্ষে নবী মুহাম্মদ (স.)-এর বেশ কিছু হাদীসও রয়েছে। এক হাদীসে নবী (স.) বলেন, "যালিমের সামনে সত্য কথা বলা [প্রতিবাদ করা] উত্তম জিহাদ।" (Al Tirmidhi, Abu Isa Muhammad, *Sahih Tirnidhi*, Cairo, Dar al Hadith 1987, vol. IV, p. 409) আরেক হাদীসে নবী (স.) বলেন, "তোমরা তোমাদের ভাইকে সাহায্য কর যদি সে মাযলুম অথবা যালিম হয়। একজন সাহবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আমি অবশ্যই আমার মাযলুম ভাইকে সাহায্য করব। কিন্তু যালিমকে কীভাবে সাহায্য করব? নবী (স.) উত্তর দিলেন, তাকে যুলুম থেকে বিরত রেখ অথবা তার যুলুম প্রতিরোধ কর। এটাই তাকে সাহায্য করা।" (*সহীহ বুখারী*, কিতাবুল ইকরাহ, হাদীস নম্বর ৬৫৫২) নবী (স.) বলেন, "জনতার নিকট একজনকে যদি জালেম বলে প্রতীয়মান হয়, আর তারা যদি তার বিরোধিতা না করে, তাহলে আল্লাহ তাদের সকলকে শাস্তি দিবেন।" (Al Nawawi, Abu Zakariya, *Riyadd al-Salehin*, Beitut: Dar al-hadith, n.d. p. 109) নবী (স.) বলেন, "যতদিন পর্যন্ত শাসক আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অমান্য করার আদেশ না দিবেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁর আনুগত্য করা আবশ্যক। শাসক আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ দিলে তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করা এবং তাঁর প্রতি অনুগত থাকা যাবে না।" (Asqalani, Ibn Hajar, *Fath al-Bari bi Sharh al-Bukhari*, Beirut: Dar al Fikr, 1993, vol. XIV, p. 121; দেখুন Abu Dawud, Sulayman, Sunan e Abu Dawud, Cairo, Dar al-Hadith, vol. IV, p. 94) আরেকটি হাদীসে নবী (স.) বলেন, একজন মুসলিম তার শাসকের আদেশ-নিষেধ, তা তার পছন্দ হোক না না হোক, অবশ্যই মেনে চলবে, যদি তা পাপকার্যে লিপ্ত হওয়ার আদেশ না হয়। যদি তা পাপকার্যে লিপ্ত হওয়ার আদেশ হয় তা হলে তা পালন করা যাবে না।" (*Sahih Bukhari*, Book on judgments, no. 7144; *Sahih Muslim*, Book on rulership, no. 1839; Sunan al-Tirmidhy, Book on. Jihad, no. 1707; Abu Dawud, *Sunan*, Book on Jihad, no. 2626; Ibn Majah, *Sunan,* Book on Jihad, no. 2864; and Ahmad ibn Hanbal, *Musnad,* vol. 2, p. 142)

অন্য আরেকটি হাদীসে কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত প্রকাশ্য কুফরীতে লিপ্ত হলে শাসকের বিরুদ্ধে অবাধ্যতা প্রদর্শনের বৈধতার কথা বলা হয়েছে। *(Sahih Bukhari*, Book on trials, no. 7056; *Sahih Muslim,* Book on ordained punishments, no. 1709; Al-Nasa'i, *Sunan,* Book on Al-Bay'ah, no. 4162; Ibn Majah, *Sunan,* Book on Jihad, no. 2866; Ahmad ibn Hanbal, Musnad, vol. 5, p. 325; Malik, *Al-Muwatta*, Book on Jihad, no. 977; and Al-Darimy, *Sunan,* Book on military expeditions, no. 2453)

শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যাপারে হযরত আলী (রা.)-এর বক্তব্য এ প্রসঙ্গে খুবই প্রাসঙ্গিক। হযরত আলী (রা.) বলেন, "খারেজীরাও যদি ন্যায়সঙ্গত কারণে অন্যায্য শাসকের (unjust rular) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, এ বিষয়ে খারেজীদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের লড়াই করা উচিত হবে না।" (Abi-Shayba, AbdAllah Muhammad, *Al-Musnanaf fil-Ahadith wa al-Athar,* Bairut. Dar al Fikr, 1989, vol. VIII, p. 737) হযরত আবু বকর (রা.) খলিফা থাকাকলীন সময়ে বলতেন,"যদি আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্যে বহাল থাকি তাহলে তোমরা আমাকে মান্য করবে এবং যদি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিধি-বিধান অবজ্ঞা করি, তাহলে তোমাদের আনুগত্য পাওয়ার কোন অধিকার আমার নেই।" (Ali, Amir, *A Short History of Saracens,* 1899. p. 22)

দুই বিপরীত মতের সমন্বয়

উপর্যুক্ত উভয় মতের প্রবক্তারাই আল কুরআন এবং হাদীস থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কুরআন ও হাদীসে কোন কোন ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে স্থিতিশীলতা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যায়-অপরাধ, যুলুম-নির্যাতন ইত্যাদি প্রতিরোধের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

প্রথম পক্ষের মতের অনুসারীদের যুক্তি হচ্ছে একটি দেশের জনগণের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা বজায় থাকা দেশ-জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য অত্যধিক জরুরী। জনতা সরকার বা শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে জাতি ও দেশের মধ্যে নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়বে। নাগরিকেরা শান্তির পরিবর্তে অস্থিরতা ও নিরাপত্তাহীনতায় নিপতিত হবে। এ কারণে শাসকের প্রতি অনুগত থাকা বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় পক্ষের মতের অনুসারীদের যুক্তি হচ্ছে যে, শাসক যদি ইসলামী বিধি-বিধান থেকে বিচ্যুত হন। এবং অন্যায়-অপকর্মে লিপ্ত থাকেন। দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হন, বরং দুর্নীতি-দুঃশাসন তাকে গ্রাস করে ফেলে তাহলে জনগণের বৃহৎ স্বার্থে তাঁর অপসারণ এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। কেননা তার কারণে দুর্নীতি, দুষ্কৃতি নিরসন হচ্ছে না। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা না হলে, এবং তাকে অপসারণ করা না হলে জনগণের দুর্ভোগ আরো বৃদ্ধি পাবে এবং জাতি ও দেশের ক্ষতি ক্রমান্বয়ে আরো দুঃসহনীয় হয়ে পড়বে। এ বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করার প্রয়াস নেয়া হয়। তাই অন্যায্য শাসকের আনুগত্য পরিহার করে বিদ্রোহ করা বাঞ্ছনীয়। ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে ইসলামের এই দ্বিতীয় মতেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

উভয় মতের অনুসারীরাই এ বিষয়ে একমত যে, ন্যায্য শাসকের আনুগত্য করা ফরজ। এবং ন্যায্য শাসকের আনুগত্য না করা গুণাহের কাজ। তাদের ভিন্নতা কেবল অন্যায্য শাসক প্রসঙ্গে। তবে উভয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতি, দেশ তথা জনগণের বৃহত্তর কল্যাণ নিশ্চিত করা।

উপসংহার

এদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর ১৯৬৯ এবং ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা তা নেয়নি। তাহলে ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪ সালের কূটকৌশলের নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হতো না। বস্তুত এদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের মধ্যেই অন্যায় অপকর্মের বীজ নিহিত রয়েছে। দলের গঠনতন্ত্রে মহৎ কথা যা-ই থাকুক তাদের রাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিত্ত-বৈভব, প্রাচুর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও যশ-খ্যাতি লাভ করা। এ সবের জন্য রাজনীতিকে তারা মাধ্যম বানিয়েছে। অবশ্য দেশের কিছু কিছু নির্মোহ, নির্লোভ, দেশপ্রেমিক মানুষ যে রাজনীতিবিদ নয়, তা নয়। আমি অধিকাংশের কথা বলছি। এই অধিকাংশের দ্বারাই গত ৫৩ বছরে দেশ ও জাতির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা না থাকলে বারবার গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়েও দেশকে সঠিক গতি-প্রকৃতির সড়কে ধাবিত করা সম্ভব হবে না। দুনিয়ার প্রতি আসক্তিই আমাদের রাজনীতিবিদদের ভুল পথে নিয়ে যায়। নবী মুহাম্মদ (স.) বলেন, "হুব্বুদ দুনিয়া রা'সুন কুল্লু খতিয়াতিন।" অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি মোহই হচ্ছে সকল অন্যায়-অপকর্মের মূল। দুনিয়ার প্রতি আসক্তিই রাজনীতিবিদদের মহৎ, নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিসর্জন দিয়ে লোভ-লালসা, প্রতিহিংসা, বিত্ত-বৈভব, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অবৈধভাবে ক্ষমতারোহণ ও ক্ষমতা ধরে রাখার দিকে আকুণ্ঠ নিমজ্জিত করে।

ইসলামের নীতি হচ্ছে, “আমি মাযলুম হব না, আবার যালিমও হব না।” অর্থাৎ, তোমরা অন্যের ওপর যুলুম করবে না, অতঃপর তোমাদের ওপরও যুলুম করা হবে না। (আল কুরআন, ২:২৭৯)

আশা করছি ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের যে দর্শন তা থেকে আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক দলসমূহ সঠিক শিক্ষা লাভ করবে। তারা প্রকৃতই দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ হবেন। নিজের ব্যক্তি স্বার্থে নয়, অন্তরে ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানের চেতনা ও দর্শন ধারণ করবেন।

আমাদের রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ দুর্নীতি ও যুলুম-নির্যাতনের পথ পরিহার করবে। “কোন সম্প্রদায়ের প্রতি তোমাদের বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে (তাদের প্রতি) যুলুম করতে প্ররোচিত না করে।” আল কুরআনের এ বাণীর (৫:২) প্রতিফলন আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাজনীতির মধ্যে প্রতিফলিত হোক ২০২৪-এর বিশ্বদর্শন দিবসে এ প্রত্যাশাই করছি। আর শত্রুর প্রতিও যুলুম নয়; স্বজনের জন্য বাড়তি সুবিধা নয় এবং অণু পরিমাণও দুর্নীতি নয় – এ হোক গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এর দীক্ষা।

ঢাকা
২১ নভেম্বর, ২০২৪

Understanding Historical Materialism as a Scientific Theory of Society

Haroon Rashid*

Historical materialism is the extension of philosophical (dialectical) materialism to the understanding of social life. The great contribution of Marx and Engels to the development of scientific thought was that they extended it to the study of society. It is a great achievement in scientific thinking, which shows how out of one social system another (higher) system develops. Historical materialism discloses the most general law of development of human society. Marx and Engels arrived at historical materialism by extending philosophical materialism and materialistically revised dialectics to the interpretation of society and made materialist world outlook comprehensive and consistent. Showing the inseparable connection between historical materialism and general philosophical materialism Lenin wrote:

> Marx deepened and developed philosophical materialism to the full, and extended the cognition of nature to include the cognition of human society. His historical materialism was a great achievement in scientific thinking … a strikingly integral and harmonious scientific theory, which shows how, in consequence of the growth of productive forces, out of one system of social life another and higher develops…[1]

The application of the general laws of dialectical materialism to social development is historical materialism. However, the laws take a specific form in society. So, to know the laws of development of human society, we have to study the specific forms in which they take effect in the history of human society in social life. The law of the unity and struggle of opposites takes the form of class struggle only in a society with antagonistic social relations, and class struggle has a great diversity of forms and trends in various historical epochs. The dialectical method becomes concrete, historical, when applied to society. Hence, the dialectical method and its application to society, and the historical method are identical in essence. In addition to general philosophical categories, we have sociological categories, such as, social reality, social consciousness, mode of production, socio-economic formation, the basis and the superstructure, social classes, and so on.

Marx and Engels revealed the dialectical materialist character of the development of society, and thereby formulated historical materialism as a scientific theory of social development. How does human society develop? What are the driving forces of society? Are

---

* Honorary Professor, Department of Philosophy, University of Dhaka. Email: *haroonrashid@du.ac.bd*

the changes of society accidental or are they dictated by necessity, by objective laws? Is the development of society causally conditioned or determined? If so, then what is the chief cause? What is the foundation of social life? These are the basic questions of social development with which historical materialism is concerned. Prior to dialectical materialism, many ideas about social development were expressed by philosophers and social scientists.[2] Their views came nearest to the correct ideas of social development, but those ideas were not scientific because of their idealist approach. The French materialists, for example, showed the influence of the social environment on man, but regarded this environment as the product of human reason or ideas ("ideas rule the world" was the epitome of their view of society); Hegel, in spite of his ideas of historical necessity and the dialectical understanding of the history of mankind, ultimately arrived at the idealist conclusion that society is ruled by divine will (God), the realistion of whose plan constitutes the world. The views of the pre-Marxist sociologists were also based on the idealistic premise that ideas rule the world and that the ideas of great men (outstanding individuals like Kings, military rulers, scholars, etc.) make history. Being idealists they were unable to reveal the dialectics of the historical process, to grasp the unity and interconnections of social life, the real driving forces and material sources behind historical events.

Marx and Engels freed philosophy and social science from this idealistic view of society and provided a materialistic interpretation of social development. Revealing the contradictory development of society, they created historical materialism as a qualitatively new theory of social development. Historical materialism is a materialistic understanding of history, according to which every society has a material, objective basis. History starts with material production (economic activity), which is the objective basis (real foundation) of society and on which arises a legal and political superstructure. In the introduction to his *A Contribution to the Critique of Political Economy* Marx gave the classical formulation of the basic propositions and principles of historical materialism:

> In the social production of their existence, men inevitably enter into definite relations, which are independent of their will, namely relations of production appropriate to a given stage in the development of their material forces of production. The totality of these relations of production constitutes the economic structure of society, the real foundation, on which arises a legal and political superstructure and to which correspond definite forms of social consciousness. The mode of production of material life conditions the general process of social, political and intellectual life. It is not the consciousness of men that determines their existence, but their social existence that determines their consciousness.[3]

This is the scientific formulation of Marxist social theory or theory of history (historism), known as historical materialism. Marx and Engels solved the fundamental

question of philosophy as applied to society and formulated the principal postulate of historical materialism: "social being (reality) determines social consciousness."[4] This scientific formulation of the basic principles of Marxist social theory (historism) demonstrates its two most important features: first, the application of the materialist view of history as a law-governed process, conditioned by the development of the mode of production, and, second, strict historism, the consideration of society in a state of constant change and development.[5]

The first premise of all human history is the existence of living (real, concrete) human individuals, their activity and the material conditions of their life, which can be verified in a purely empirical way. This is how Marx and Engels expressed their scientific, materialistic understanding of history (historical materialism) in *The German Ideology.* They formulated their theory from the simple fact of history that "before people can engage in science, philosophy, art and so on, they must get food, clothing and shelter, for which they must work, produce material wealth." As they said:

> … we must begin by stating the first premise of all human existence and, therefore, of all history, the premise, namely, that men must be in a position to live in order to be able to "make history." But life involves before everything else eating and drinking, housing, clothing and various other things. The first historical act is thus production of the means to satisfy these needs, the production of material life itself. And indeed this is a historical act, a fundamental condition of history, which today, as thousands of years ago, must daily and hourly be fulfilled merely in order to sustain human life.[6]

Form the above passage it follows that the production of material life (means of subsistence) and consequently the degree of economic development of a certain period form the foundation upon which political and legal institutions, and various forms of ideas (art, religion, philosophy etc.) have been evolved. Among numerous social relations, Marx and Engels considered production relations as the principal, decisive ones, and arrived at the concept of the socio-economic formation as the fundamental concept of historical materialism. The socio-economic formation, as they maintained, is the totality of social phenomena and processes based on a historically determined mode of production, and society develops through the replacement of one socio-economic formation by another (more improved). Thus, through this materialistic conception of history Marx and Engels showed that the masses (the working people) are the real makers of history, material wealth is produced by the labour of the working people, which constitutes the foundation of man's material life.

The study of society and the laws of its development is the subject-matter of historical materialism. It deals with the general laws and the driving forces of the development of

society as an integrated whole (not with the separate aspects of social life), the internal connections and contradictions of all aspects, and relations of social life. Unlike the specialized sciences, historical materialism studies "the most general laws of the development of society, the laws of the emergence, existence and motive forces of the development of socio-economic formations." It also differs from historical science, the science of history, which studies the history of countries and people, of events. Historical materialism, on the other hand, is a general theoretical (methodological) science, which studies, not one particular people, or one particular country, but human society as a whole. It provides the dialectical materialist solution to the basic, epistemological question of social science – the question of the relationship between social being and social consciousness. It tells us about the most general laws and driving forces of society and is therefore a general sociological theory.[7]

Historical materialism gives us an objective basis for scientific orientation in historical events, enables us to know and understand them, and to predict them scientifically. It not only relates the laws of society to the laws of nature, but also shows that the socio-historical law radically differs from the law of nature, which is expressed in Marx and Engels' description of social development as a 'natural historical process.' The natural historical process is a process that is as necessary and objective, as much governed by law, as the natural process. It is a process that not only does not depend on men's will and consciousness but actually determines their will and consciousness; and at the same time, unlike the processes of nature, the natural historical process is a result of people's conscious activity.[8] Like the laws of nature, the laws of social development are objective, i.e., independent of man's consciousness and that they are knowable and are applied by man in his practical activity. The laws of social development, however, are quite different from those of nature. While the laws of nature reflect the operation of spontaneous forces, the laws of social development are manifested through the conscious activity of the people.

Historical materialism proceeds from the proposition that social reality (being, existence) is primary in relation to social consciousness. Social consciousness is a reflection of social reality. Social reality is the material life of society, its production and reproduction. It is comprised of social production and the necessary conditions for it, including the reproduction of people themselves and the system of social relations that arises in the process of the production of material goods. Social reality is primary in the sense that it is independent of social consciousness, and social consciousness is secondary in the sense that it is the reflection of social reality. Here the question arises: how can the independence of social reality from social consciousness be understood? Do people themselves not create their means of production? No doubt, people themselves build their social life, and perform the act of production consciously. But not always and not everywhere do they build it consciously; they are not always conscious of the character of the social relations into which they enter in the process of production. Driven on by material necessity, people work, produce and consume,

and thus formed production relations (economic relations), which do not depend on their conscious choice and desire, but on the level of social production. People's will, aims, desires and aspirations are conditioned by their material interests and they work or produce out of these interests; Marx and Engels regarded this as a historical necessity, and characterize the process of social development as a natural historical process. In the words of Engels:

> History is made in such a way that the final results always arises from conflicts between many individual wills, of which each in turn has been made what it is by a host of particular conditions of life. Thus there are innumerable intersecting forces, and infinite series of parallelograms of forces which give rise to one resultant – the historical event. This may again itself be viewed as the product of a power which works as a whole unconsciously and without volition. For what individual wills is obstructed by everyone else, and what emerges is something that no one willed. Thus history has proceeded hitherto in the manner of a natural process and is essentially subject to the same laws of motion.[9]

The process of social development is, thus, a natural historical process, historical necessity, which naturally follows from the internal connection of social phenomena and therefore, is bound to take place. Social development is a historical necessity in the sense that it is conditioned by objective causes and laws that exist independently of man's will and consciousness. Social development, however, as a natural historical process do not ignore the role of man's conscious and creative activity. It does not belittle the role of the subjective factor, the historical activity and initiative of the progressive forces. It is true that historical materialism emphasizes more on economic factor (social reality) rather than on various forms of social consciousness (philosophy, morality, religion etc.), but it does not in any way ignore the significance of social consciousness, of various spiritual values, rather it recognizes their important role in social life. The laws of social development, unlike the laws of nature, are laws of human activity. Outside this activity they do not exist. Just as knowledge of the laws of nature offers us the best chance of taming its spontaneous forces, so does knowledge of the social laws as the driving force of social development allow people to create history consciously.

Historical materialism enables us to know the objective laws of social development and to act consciously and freely, not blindly or spontaneously. Therefore, historical necessity is not the same thing as predetermination. In real life, thanks to the objective laws of social development, there arises certain possibilities, the realisation of which depends on the conscious activity of the people. So, the knowledge of the laws of historical necessity (of the objective laws of social development) demands people's active and conscious participation in order to realise these laws. The objective laws of social development as natural historical process does not belittle the role of man and his conscious activity, but rather shows the

significance of this activity. The subject-matter of historical materialism is human society and the laws of its development. The first step towards discovering these laws is to establish the role of material production in the life of society. It is, therefore, obvious that society cannot exist without producing the material goods needed for human life. However, in the process of production people do not only create material products and production does not only provide people with means of subsistence, but they also produce and reproduce their own social relations in producing material goods.

References

1. Lenin, "The Three Sources and Three Component Parts of Marxism", *Collected Works,* Vol. 19, p. 25, Quoted in F.V. Kanstantinoved, *The Fundamentals of Marxist-Leninist Philosophy,* Eng. Trans. by Robert Daglish, Progress Publishers, Moscow, 1982, p.196. Marx and Engels formulated the basic propositions of historical materialism in the 1840s in such works as the *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*, *The Holy Family*, *The German Ideology*, *The Poverty of Philosophy*, *Contribution to the critique of Political Economy* and *The Communist Manifesto.*
2. For example, the French materialists of the 18th century (La Mettri , Diderot, Holbach) asserted that man's ideas and behaviours are a result of the influence of social environment; French historians (Guizot, Thierry, Mignet) pointed to the existence of opposite classes and the class struggle in society; British classical political economists (Smith, Ricardo) tried to find basis for the existence of classes in economic life; French Utopian socialist (Saint Simon, Fourier) anticipated a future communist society.
3. Marx, *A Contribution to the Critique to Political Economy*, Translated from the German by S. W. Ryazanskaya, Progress Publishers, Moscow, 1971, pp. 20-21.
4. Social being encompasses the material life of society and people's productive activity, the economic (productive) relations between them in the process of production; social consciousness is the spiritual life of people, the ideas, theories and views which guided them in their activities.
5. F.V. Kanstantinoved, *The Fundamentals of Marxist-Leninist Philosophy*, Eng. Trans. by Robert Daglish, Progress Publishers, Moscow, 1982, p. 201.
6. Marx-Engels, *The German Ideology*, Progress Publishers, Moscow, 1976, p. 47.
7. *The Fundamentals*, pp. 199-200. Before the appearance of historical materialism sociological thought, under the influence of the advances in natural science, sought to understand social life, the history of society as a law-governed process. But social laws were generally treated in the same way as the laws of nature, i.e., of the mechanical, physical and biological processes occurring in nature and therefore, the specific features of social life and people's conscious activities were ignored.
8. This proposition seems to imply a logical contradiction. How can the fact that the historical process created by men's will and consciousness be reconciled with the fact that history obeys certain necessary, objective laws that do not depend on men's will and consciousness? This contradiction can be explained by the fact that people (particularly large groups of people-nations, classes, parties, etc.), in pursuing their aims, being guided by certain interests, ideas and desires, at the same time always live under certain objective conditions that do not depend on their will and desire and that ultimately determine the character of their activity, their interests, ideas and desires. (*The Fundamentals*, p. 202.)
9. Quoted in *The Fundamentals,* pp. 203-204, Engels to J. Block in Konigsberg, London, September 21 [22], 1890, in K. Marx and F. Engels, *Selected Works*, Vol. 3, p. 488.

ছোটদের নৈতিক শিক্ষা

মো. নূরুজ্জামান*

ভূমিকা

মানুষের সৃজনশীলতার বিকাশ, জগৎ ও জীবনের জটিল সমস্যার সবিচার চিন্তা, সর্বোপরি একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় দর্শনের গুরুত্বকে উপলব্ধি করে ইউনেস্কো ২০০৫ সাল থেকে প্রতি বছর নভেম্বর মাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার এর সদস্যভুক্ত দেশসমূহে বিভিন্ন বিষয়কে প্রতিপাদ্য করে বিশ্ব দর্শন দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে। এর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন দর্শনের ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়, আবার সমকালীন বিশ্বের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যার যৌক্তিক সমাধানে দর্শনের কার্যকর ভূমিকাও স্বীকৃত হয়। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ ইউনেস্কোর এ উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে একেবারে শুরু থেকেই প্রতি বছর বিশ্ব দর্শন দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে। ইউনেস্কোর এরূপ কার্যক্রমের মাধ্যমে অনুধাবন করা যায় যে, সমতা-ন্যায্যতা-মানবাধিকার-গণতন্ত্র–বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহারে দর্শনের অন্যতম শাখা নীতিবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইউনেস্কো মানুষের ব্যক্তিগত ও পেশাগত কাজে নৈতিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে দক্ষ করার নিমিত্তে বিভিন্ন কর্মসূচিও গ্রহণ করেছে। আমি মনে করি শিশুকাল থেকেই নৈতিক শিক্ষার সামাজিক ও একাডেমিক অনুশীলন শুরু করা সম্ভব হলে পরিণত বয়সে ব্যক্তি সামাজিক ও পেশাগত দায়িত্ব নৈতিকভাবে পালন করে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ তথা শান্তিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। আমি এ প্রবন্ধে নৈতিক শিক্ষা কী? ছোটদের নৈতিক শিক্ষার প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু, নৈতিক শিক্ষা প্রদানের উপায় এবং প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করব।

নৈতিক শিক্ষা কী?

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে হয়, সে সমাজের অন্য সদস্যদের সাথে বিভিন্ন রকমের সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। এ প্রক্রিয়ায় তাকে বিভিন্ন রকমের আচরণ করতে হয়। এ আচরণের ভালোত্ব-মন্দত্ব, ঔচিত্য-অনৌচিত্য, ন্যায়ত্ব-অন্যায়ত্বের শিক্ষাই নৈতিক শিক্ষা। বিভিন্ন বয়সের নৈতিক শিক্ষা নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে জে. মার্ক হ্যালস্টেড বলেন, নৈতিক শিক্ষাকে শিশু ও তরুণদের আচরণের সঠিক ও ভুল সম্পর্কে এক সেট বিশ্বাস ও মূল্যবোধ অর্জনের উপায় হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। বিশ্বাসের এ সেট অন্যদের এবং পরিবেশের প্রতি তাদের অভিপ্রায়, মনোভাব ও আচরণের নির্দেশনা প্রদান করে (২০১০, ৬৩০)। এর মাধ্যমে সে বুঝতে সক্ষম হয় সমাজ তার নিকট কীরূপ আচরণ প্রত্যাশা করে এবং তাদের কীরূপ আচরণ করা উচিৎ। নৈতিক শিক্ষা ছোটরা পরিবার, সমাজ ও বিদ্যালয় থেকে অর্জন করে।

নৈতিক কর্তা হিসেবে শিশু

সাধারণত দেখা যায় শিশু এমনকি পূর্ণ বয়স্ক অনেকের মধ্যে যথাযথ মাত্রার প্রজ্ঞার অভাব থাকে বিধায় অনেকে তাদেরকে নৈতিক কর্তা হিসেবে বিবেচনা করতে চান না। আবার অনেকে দাবি করেন শিশুদের নৈতিক সত্তা রয়েছে।

* অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ইমেইলঃ *zaman.phi@du.ac.bd*

এ প্রসঙ্গে জে. ব্রিটন (২০১৫) মারজোরি মন্ত্রিউল প্রমুখ (২০১৮) শিশুদের নৈতিক সত্তা এবং নৈতিক সত্তা হয়ে ওঠা—উভয় হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এ প্রসঙ্গে জে. ব্রিটন বলেন,

> শিশুরা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নৈতিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে বেড়ে ওঠে, বয়স্করা তাদেরকে বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ায় এদেরকে পরিচয় করিয়ে দেয়। তারা আচরণের প্রচলিত নৈতিক বিধিমালা শিখে যা নৈতিক মূল্যবোধ থেকে উদ্ভূত এবং সর্বজনীন হিসেবে এদেরকে বিবেচনা করা যায় কেননা এগুলো অন্তর্নিহিত এবং অনুমিত। (২০১৫, ৪৯৫)

এভাবে তিনি শিশুকে একজন নৈতিক কর্তা হিসেবে অভিহিত করেন। প্রাথমিকভাবে তার অনেক আচরণকে সমাজ ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে হিসেবে বিবেচনা করলেও পরিবার এবং সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সে ভালো-মন্দকে বুঝতে সক্ষম হয় এবং নৈতিক কর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নৈতিক সত্তা ও নৈতিক সত্তা হয়ে ওঠা

নৈতিক সত্তা বলতে এমন এক সত্তাকে বুঝানো হয় যে সমাজের প্রচলিত বিধি বিধান, সংস্কৃতি, বিশ্বাস মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন। আর এগুলো বিবেচনা করে তার কর্ম পরিকল্পনা করে, তার কাজের দায়ভার সে গ্রহণ করে। নৈতিক সত্তার গুণাবলির মধ্যে সততা, ন্যায়পরতা, ভদ্রতা, উদারতা, সাহসিকতা, সহনশীলতা ইত্যাদিকে বোঝানো হয়ে থাকে। এসব গুণাবলিসম্পন্ন একজন ব্যক্তি সহজেই সমাজের প্রত্যাশিত আচরণকে অনুধাবন করতে পারে এবং কাঙ্ক্ষিত আচরণ করে নৈতিক সত্তার বিকাশ ঘটিয়ে সমাজের একজন অপরিহার্য সদস্যও হয়ে উঠে। এরকম নৈতিক সত্তাসম্পন্ন হয়ে ওঠার জন্য প্রজ্ঞা অত্যাবশ্যক। কেননা প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিই তার আচরণের ভালোত্ব-মন্দত্ব, ন্যায়ত্ব-অন্যায়ত্ব নির্ধারণ করতে পারে।

একটি শিশু কিংবা কিশোরের নিকট থেকে আমরা অনুরূপ নৈতিক আচরণ প্রত্যাশা করতে পারি না। কেননা তার প্রজ্ঞার বিকাশ হয় নাই কিংবা সে প্রাপ্ত বয়স্ক একজন ব্যক্তির মতো প্রজ্ঞা সম্পন্ন নয়। ফলে তার নৈতিক সত্তারও পুরোপুরি বিকাশ হয়নি, তবে সে প্রাথমিকভাবে বাবা-মা কিংবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সান্নিধ্যে থেকে বিভিন্ন আচরণের মাধ্যমে তাদের কাঙ্ক্ষিত আচরণকে অনুধাবণ করতে পারে। আর এর মধ্য দিয়ে সে ভালো-মন্দেরও ধারণা পায়। এক পর্যায়ে সে বিদ্যালয়ে যায়, সেখানে আরো একটি বৃহত্তর পরিবেশে প্রবেশ করে কিছু সামাজিক বিধি-বিধানের সাথে পরিচিত হয়। তার নৈতিক সত্তা হয়ে ওঠার সুযোগ ও পরিধি উভয়ই বিস্তৃত হয়। ক্রমে তার শিক্ষার পরিধি বিস্তৃত হয়; ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে সবিচার চিন্তার অধিকারী হয়। নিজের ভালোর সাথে অপরের ভালো কিংবা অপরের ভালোর সাথে নিজের ভালো বুঝতে সক্ষম হয়। এক পর্যায়ে সে কেবল মানুষের ভালো নয়, অন্যান্য প্রাণী কিংবা পরিবেশ-প্রকৃতির ভালোত্ব-মন্দত্বকে জানতে-বুঝতে পারে। আর এভাবেই একজন শিশু পারিবারিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে নৈতিক শিক্ষার যাত্রা শুরু করে এবং পরবর্তীকালে সামাজিক ও একাডেমিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে একজন নৈতিক সত্তাসম্পন্ন প্রাণী হয়ে ওঠে। এবার কিছু নৈতিক গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করব।

সদাচার

সাধারণত সদাচার বলতে আমরা প্রত্যাশিত আচরণকে বুঝে থাকি। সদাচারের কোনো সুনির্দিষ্ট কিংবা সর্বজনীন সংজ্ঞা প্রদান করা যায় না। সংস্কৃতি, বিশ্বাস কিংবা মূল্যবোধের ভিন্নতা সদাচারের প্রকৃতির মধ্যে ভিন্নতা দেখা দেয়। একটি শিশু তার পরিবারের মধ্যেই সদাচারের সাথে পরিচিত হয়। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিত্যদিনের কাজ দেখতে দেখতে সে বুঝে নেয় কোন আচরণটি অন্য সদস্যদের নিকট প্রত্যাশিত আবার কোন আচরণটিইবা অপ্রত্যাশিত।

কোনো একটি আচরণের মাধ্যমে সে অন্য সদস্যদের নিকট থেকে প্রশংসা পায়। আবার কোনো আচরণের ফলে অন্য সদস্য তাকে সংশোধন করে দেয়, অথবা সঠিক আচরণটি বুঝিয়ে দেয়। এভাবে সে ভালো-মন্দের ধারণার সাথে পরিচিত হয়। প্রাথমিকভাবে বড়দের উৎসাহ-অনুপ্রেরণাদীপ্ত কাজের মাধ্যমে সে ভালোকে অনুধাবণ করতে পারে। আবার বিপরীতভাবে বড়রা যে কাজে অনুৎসাহিত করে তার মাধ্যমে সে মন্দকে জানতে-বুঝতে পারে।

সদগুণ

সদগুণ বলতে আমরা কোনো ব্যক্তির ভালো গুণকে বুঝে থাকি। এসব গুণাবলি একজন মানুষের চরিত্রকে উৎকর্ষ প্রদান করে। বিপরীতভাবে অসদগুণাবলিসম্পন্ন মানুষকে অসৎ বা খারাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ সদগুণাবলির ধারণা মানবসভ্যতার প্রারম্ভিক অবস্থার মধ্যেই ছিল বলে অনুমান করা যায়। তবে এরিস্টটলের আলোচনার মধ্য দিয়ে তা সুসংবদ্ধ আকার ধারণ করে। এরিস্টটল প্রজ্ঞা, সংযম, সাহস, ন্যায়পরতা এসব গুণকে সদগুণ বলে অভিহিত করেন। এসব গুণাবলি মানুষ তার কাজ বা অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করে। আর এগুলো অর্জন ও অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষ নিজে যেমন ভালো কিংবা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে, তদ্রূপভাবে একটি সুস্থ সমাজ গঠনেও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। সুতরাং আমরা দাবি করতে পারি যে, আমাদের সকলেরই এসব গুণাবলি অর্জন করা অপরিহার্য। আর এ বোধ থেকে শিশুদেরকে এসবের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া অথবা ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের এসব গুণাবলি অর্জনের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

পরিবার ও নৈতিক শিক্ষা

পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করেছি যে, একটি শিশুর প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হলো তার পরিবার এবং প্রথম শিক্ষক হলো পিতামাতা। পিতামাতার মাধ্যমে সে যেমন চারপাশের বিভিন্ন বস্তুকে জানতে-বুঝতে শুরু করে, তদ্রূপভাবে তার আচরণের ভালো-মন্দকেও অনুধাবন করতে পারে। তার কোনো একটি কাজকে পরিবারের সদস্যরা উৎসাহিত করে, ফলে সে বুঝতে পারে এটি অন্যদের নিকট কাঙ্ক্ষিত আচরণ। আবার বিপরীতভাবে তার কিছু কাজে পরিবারের অন্য সদস্যগণ নিরুৎসাহিত হন অথবা তা করতে বারণ করে। এ থেকে সে অনুধাবন করে এগুলো মন্দ কাজ। এভাবে প্রাথমিকভাবে সে তার আচরণের ভালোত্ব-মন্দত্ব জানতে-বুঝতে পারে। পিতামাতা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ শিশুর এ প্রাথমিক নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে। নৈতিক শিক্ষা প্রদানের উপযুক্ত পরিবেশ পরিবারের মধ্যেই বিরাজমান থাকে। কেননা পরিবারের মধ্যে একটি শিশু নির্ভয়ে বিচরণ করতে পারে, তার ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছার প্রকাশ ঘটায়। এর ফলে শিশুকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ সহজেই অনুধাবন করতে পারে। তার কোনো নেতিবাচক প্রবণতাকে দমন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া যায়।

আর শিক্ষা কেবল একাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত পিতামাতা প্রদান করেন, এমন নয়। এক্ষেত্রে পিতামাতা সমাজের প্রচলিত বিধিমালার সাহায্য নেয়। প্রতিটি সমাজেরই নিজস্ব কিছু নৈতিক বিধিবিধান রয়েছে, এসবের সাথে এর প্রতিটি সদস্যই পরিচিত। এসব বিধিবিধান মেনে চলে তারা শান্তিপূর্ণ সামাজিক জীবনযাপন করে। প্রতিটি শিশু বৃহত্তর সামাজিক জীবনে প্রবেশের পূর্বেই এসব বিধিমালার সাথে পরিবার বা পিতামাতার মাধ্যমে পেয়ে থাকে। সমাজের প্রচলন ছাড়া ধর্মীয় শিক্ষা নৈতিক শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে উল্লেখ্য যে, কেবল নৈতিক শিক্ষা মৌখিকভাবে প্রদান করলে শিশুকে যথাযথ নৈতিক শিক্ষা দেওয়া যাবে না। শিশুরা তার পিতামাতাকে মডেল হিসেবে বিবেচনা করে, ফলে তাদের আচরণ শিশুর নৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কাজেই নিজেরা

নৈতিক জীবনযাপন করলেই শিশুদের সামনে মডেল হিসেবে উপস্থাপিত হয়ে তাদেরকে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা যায়।

স্কুলে নৈতিক শিক্ষা

পরিবারের গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহত্তর সমাজের প্রথম ধাপ শিশুর স্কুলে প্রবেশ। ফলে স্কুল একটি শিশুর সুনাগরিক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুনাগরিকতার সাথে নৈতিক শিক্ষার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সততা, ন্যায়পরতা, সাহসিকতা, পরোপকারিতা, সহমর্মিতা এসব গুণাবলির সাথে স্কুলের শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদেরকে পরিচয় করিয়ে দেয়। বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষকগণ ছোট ছোট শিশুদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যেমন যৌথভাবে কোনো কাজ করা। টিফিন নিজেদের মধ্যে ভাগ করে খাওয়া।

শিশুরা তাদের পিতামাতাকে যেমন মডেল হিসেবে বিবেচনা করে, তদ্রূপভাবে স্কুলের শিক্ষকদেরকেও মডেল হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে শিক্ষার্থীদেরকে নৈতিক শিক্ষা কেবল শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন পাঠক্রমের মধ্যে সীমিত না রেখে শিক্ষকদেরকে তাঁদের আচার-আচরণে নৈতিকতার মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রতিটি শিশুর আবেগ-অনুভূতিকে সমানভাবে সম্মান করতে হবে। তারা যেমন কোনো প্রকার বৈষম্যের শিকার না হয়। কেননা এরূপ বৈষম্য থেকে তার মধ্যে বঞ্চনাবোধের সৃষ্টি হবে। যার ফলে শিক্ষক তথা বৃহত্তর সমাজের প্রতি তার ভীতি কিংবা ঘৃণার জন্ম নিবে। যা পরবর্তীকালে শিশুর সুনাগরিক হতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। উল্লেখ্য যে শিশুর নৈতিক শিক্ষায় স্কুল তার পরিবারের সাথে যৌথভাবে কাজ করতে পারে। কোনো শিশু স্কুল বা সমাজের কাঙ্ক্ষিত আচরণে অক্ষম হলে তা পিতামাতা কিংবা অভিভাবকের সাথে শেয়ার করতে পারে। আবার অভিভাবকবৃন্দ শিশুর চরিত্রের কোনো একটি বিশেষ দুর্বলতা শিক্ষকদের সাথে শেয়ার করে তা থেকে মুক্ত করার উদ্যোগ নিতে পারে।

পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা একান্তভাবে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি নির্ভর। ফলে শিশুদের মনে শিক্ষকগণ আচার-আচরণে মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষার মডেল হিসেবে বিবেচিত হলেও সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণ করতে হয়। অন্যান্য বিষয়ের মতো নৈতিক শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং পাঠদানের উপায় নিয়ে আলোচনা করে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়। ছোটদের এরূপ পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নে তাদের বয়সকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। একেক বয়সের শিশুদের জন্য একেক রকমের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়। যেমন শিশুদের স্কুলে প্রবেশের একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় এক ধরণের বিষয়বস্তু, ছোটবেলা কিংবা শিশুকালেরও একটি অগ্রবর্তী বয়সকে নির্ধারণ করা যায়, আবার কিশোরবেলার উপযোগী করে স্কুল পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা যায়।

এই স্তরভিত্তিক পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন নৈতিক প্রত্যয়ের সাথে তাদেরকে পরিচিত, অনুধাবন ও অনুশীলনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। স্কুলের গণ্ডির একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় আচরণের ভালোত্ব-মন্দত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা যেতে পারে। তাকে অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, অন্যের ভালো কাজের প্রশংসা এবং নিজে এরূপ ভালো কাজ করে অন্যের প্রশংসা কুড়ানোর বিষয়ে অনুশীলন করানো যেতে পারে। ক্রমে ক্রমে তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার সদগুণাবলি যেমন: পরোপকার, সততা, ন্যায্যতা, মহানুভবতা এসব সম্পর্কে ধারণা প্রদান কর যেতে পারে। একটু বড় হলে যেমন কিশোর বয়সে পৌঁছালে তাদেরকে নৈতিক তত্ত্বের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে সুখবাদের বিভিন্ন ধারা, কর্তব্যবিষয়ক নৈতিক মতবাদ, পরিচর্যা তত্ত্ব, ন্যায়পরতার তত্ত্ব এসব বিষয়ের জ্ঞান প্রদান করা যায়। এছাড়া এ বয়সে সাধারণত ছোটদের মধ্যে সবিচার চিন্তা, তুলনামূলক চিন্তা এসবের বিকাশ ঘটে। ফলে প্রচলিত

নৈতিক বিধানের যথার্থতা নিয়ে তারা প্রশ্ন করতে সক্ষম হয়। তাই এ পর্যায়ে তাদেরকে নিজের দেশের কিংবা নিজ অঞ্চলের প্রচলিত নৈতিক বিধানের সাথে সমকালীন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত নৈতিক বিধিবিধানের তুলনামূলক আলোচনায় অভ্যস্ত করা যায়। বিভিন্ন নৈতিক সংকট মোকাবিলার পথ কীভাবে আবিষ্কার করা যায় সেরূপ আলোচনা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবার এ পর্যায়ে তাদের পাঠ্যসূচির পরিধিও বৃদ্ধি করা যায়। আমরা জানি নীতিবিদ্যার আলোচনার পরিধি ব্যাপক। এটি কেবল মানুষের সাথে মানুষের আচরণের মধ্যে তার ক্ষেত্র সীমিত রাখেনি; মানুষসহ, অন্যান্য নিম্নতর প্রাণী ও পরিবেশের প্রতি তার দায়বদ্ধতা রয়েছে। ফলে আমরা দেখতে পাই পরিবেশ নীতিবিদ্যা, প্রাণী নীতিবিদ্যা, ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা নামক নীতিবিদ্যার বিভিন্ন উপশাখার সৃষ্টি হয়েছে। নীতিবিদ্যার এসব উপশাখা তাদের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আবার সমকালীন বিশ্বে শিশুসহ বয়স্কদের প্রযুক্তি আসক্তি বিভিন্ন রকমের সংকটের সৃষ্টি করছে। ফলে প্রযুক্তির নৈতিক ব্যবহারকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রযুক্তির নীতিবিদ্যা নামক নীতিবিদ্যার এক নতুন শাখার উদ্ভব হয়েছে। প্রযুক্তির নৈতিক ব্যবহারে অভ্যস্ত করা কিংবা প্রযুক্তির জগতে বিচরণের তার নৈতিক দায়বদ্ধতার আলোচনাকে তাদের নৈতিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

নৈতিক শিক্ষা প্রদানের উপায়

ছোটদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের বিভিন্ন উপায় বা পদ্ধতি নিয়ে গবেষকগণ কাজ করছেন। নৈতিক শিক্ষার উপায় নিয়ে অনেকে আলোচনা করেন। শিক্ষার বিষয়বস্তু তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয়ই হওয়ার দরুন এ শিক্ষার পদ্ধতির মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে। কেবল শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার মধ্যে এর কার্যক্রম সীমিত নয়, বৃহত্তর সমাজও এর শিক্ষাক্ষেত্র। প্রাথমিকভাবে শিশুদের বিভিন্ন আচরণের প্রশংসা কিংবা নিন্দা জানিয়ে তাকে ভালো আচরণে উৎসাহিত এবং মন্দ আচরণে নিরুৎসাহিত করা যায়। এসব থেকে সে ভালো-মন্দের ধারণা পাবে। সত্য কথা বলা কিংবা বন্ধুবৎসল হওয়া এসব গুণ বিবেচনা করে কোনো শিশুকে যদি প্রশংসা করা হয়, তবে এ থেকে সে সত্য কথা বলতে উৎসাহিত হবে আর এর মধ্য দিয়ে নৈতিকতার ধারণাও পাবে। অনুরূপভাবে মিথ্যা বলার মধ্য দিয়ে সৃষ্ট বৈরী অবস্থার ব্যাখ্যা দিলে সে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকবে।

গল্প বলার মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা যেতে পারে। শিশুরা সাধারণত গল্প শুনতে পছন্দ করে। আমাদের বাংলাসাহিত্যসহ বিশ্বসাহিত্যে আকর্ষণীয় অনেক নৈতিক গল্প রয়েছে। এ গল্প পড়ার মাধ্যমে শিশুরা নৈতিক শিক্ষা পেতে পারে। এরূপ প্রতিটি গল্পের শেষে তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে এ গল্পের নৈতিক শিক্ষা কী। এছাড়াও প্রতিটি গল্পের বিভিন্ন চরিত্র বিভিন্ন প্রকার নৈতিক সংকটের মধ্যে পড়ে। এসব সংকট থেকে কীভাবে তারা উত্তরণ লাভ করে এবং এদের বিকল্প কোনো উপায় আবিষ্কার করা যায় কীনা?—এসব সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে শিশুরা বিভিন্ন মত প্রদান করছে। এসব মত থেকে সর্বোচ্চ ভালো মতটিকে বাছাই করা প্রক্রিয়ায়ও তাদেরকে সংযুক্ত করা যেতে পারে। তারা বিভিন্ন যুক্তির আশ্রয় নিতে পারে। এর মধ্য দিয়ে তাদের নৈতিক চিন্তা ও সবিচার চিন্তা উভয়েরই বিকাশ হবে। এ দক্ষতা পরবর্তীকালে ব্যক্তি-সমাজ-পেশাগত জীবনে মুখোমুখি হওয়া বিভিন্ন সংকট মোকাবিলায় সহায়তা করবে।

টেলিভিশনসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শিশুদের নৈতিক শিক্ষার উদ্যোগ দেখা যায়। এসব মাধ্যমে শিশু শিক্ষায় বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ করে থাকেন। তাঁরা ছোটদের জন্য নৈতিক শিক্ষার কনটেন্ট তৈরি করেন। এসবের সাহায্যে বিভিন্ন নৈতিক প্রত্যয় থেকে শুরু করে নৈতিক সমস্যা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আবার বিভিন্ন সংকট সমাধানের জন্য নির্দেশিত পথসমূহ ছোটদেরকে আলোকিত করে।

স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা

শিশুরা সাধারণত অনুকরণ প্রিয়, সে অন্যের কাজকে দেখে শিখে। ফলে স্কুলে তাদের তাত্ত্বিক শিক্ষা প্রদানের চেয়ে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হওয়া মানুষের কাজ দেখিয়ে অথবা তাদের সহায়তার মধ্য দিয়ে নৈতিক দায়িত্ব ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবকের কাজকে তাদের সামনে তুলে ধরা যেতে পারে। তাদের নৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষকদের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবকের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কলেজসমূহে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় পর্যায়ে নীতিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। এসব পর্যায়ে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি বেশ সমৃদ্ধ। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব শিক্ষার্থীদেরকে ছোটদের নৈতিক শিক্ষায় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে। আবার ছোটরা কিশোর বয়সে পরিণত হলে তাদেরকেও প্রথমেই স্কুলে বিভিন্ন স্বেচ্ছাশ্রমে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এভাবে তাদের মধ্যে নৈতিক দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে ধারণা জন্মাবে।

ছবি বই

শিশুদের উপযোগী করে তৈরি অনেক ছবি বই পাওয়া যায়, সেসব বইয়ে কোনো গল্পকে ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। ছবির সাথে অবশ্যই কিছু বর্ণনাও রয়েছে। ছবি বই সম্পর্কে ইউ ঝাও বলেন, ছবি বই হলো সাহিত্যের এমন এক রূপ যাতে ছবি ও পাঠ্যকে একত্রিত করে এবং এগুলো প্রায়শই শিশুদের অতিরিক্ত পাঠক্রমে পড়ার উপকরণ এবং কখনো কখনো শিক্ষার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় (২০২১, ৭০৭)। নৈতিক শিক্ষার ছবি বইয়ে বিভিন্ন নৈতিক গল্পের চিত্রায়ন থাকে এবং সাথে গল্পের মূল বক্তব্যের উল্লেখ থাকে। এসব বই শিশুদের সহজেই আকৃষ্ট করে। ঝাওসহ অনেকেই দাবি করেন এসব ছবি বইয়ের পাঠ শিশুদের ভালো গুণ অর্জনে সহায়তা করে। এ প্রসঙ্গে এলেন জাভার্নিকের *হোয়াট ইফ এভরিবডি ডিড দেট* (২০১০) নামক ছবি বইয়ের নাম উল্লেখ করতে পারি। এ গ্রন্থে তিনি একজন বালকের ছোট ছোট কাজের উল্লেখ করেন যেমন চিড়িয়াখানায় কোনো পশুকে খাবার দেওয়া, চলন্ত গাড়ি থেকে কোনো কিছু ছুঁড়ে ফেলা কিংবা কোনো খেলোয়াড়ের অটোগ্রাফের জন্য মাঠে প্রবেশ করা। এসব কাজ যদি সবাই করে তবে এর পরিণতি কী হবে? এরূপ অনেক ছবি বই থেকে নিয়মানুবর্তিতা ও নৈতিক দায়িত্বের বিষয় বোঝানো যায়। উল্লেখ্য যে এসব বই বয়স বিবেচনায় রচিত হয়। আমরা পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে যেমন বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করেছি, তদ্রূপভাবে ছবি বইয়েরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বাজারধর্মী সনদপত্র অর্জন সমকালীন শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে শিক্ষা বলতে অনেকে ক্ষেত্রে চাকুরিমুখী শিক্ষা এমনকি আরো অগ্রসর হয়ে বললে অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষাকে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ব্যক্তি-জাতি-বৈশ্বিক কল্যাণের জন্য কেবল পেশাগত দক্ষতা কিংবা অর্থ উপার্জন শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর নৈতিক-সামাজিক দায়িত্বেরও দিক রয়েছে। আর এর যাত্রা শুরু করতে হবে শিশুকাল থেকে। দাবি করা হয় শিশুদের মন থাকে সহজ-সরল। এমতাবস্থায় তাদের সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলা সহজ। পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা অনুধাবন করতে পেরেছি যে, শিশুকাল থেকে ছোটদের নৈতিক শিক্ষা পরিবারের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শুরু করলে তারা সমাজের কাঙ্ক্ষিত আচরণ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে পারবে। তাদের কোন আচরণটি ভালো, আবার কোন আচরণটি মন্দ তা বুঝতে পারবে। কেবল ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণ নয়, নিজের মধ্যেই ভালো কাজের অনুপ্রেরণা পায় এবং অন্যকে ভালো কাজে অনুপ্রাণিত করে এবং মন্দ কাজ করা থেকে অন্যকে নিরুৎসাহিত করে, এমনকি মন্দ কাজকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। একটু বড় হয়ে যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা

সামাজিক দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে। বন্ধুত্ব, পরোপকার, সহমর্মিতা এসব সদগুণাবলির মাধ্যমে সৃষ্ট আবেগ ও দায়িত্ববোধ তাদেরকে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে অনুপ্রাণিত করবে।

ছোটবেলা থেকেই শিশুদের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা, সৌহার্দবোধ প্রতিষ্ঠা করা যায় তবে এসব শিশু বড় হলে তাদের দ্বারা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এরূপ সমাজে সকল ধর্মের-বর্ণের-গোত্রের মানুষ শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারবে। ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন নৈতিক সংকট নিয়ে চিন্তা করে এবং এগুলো সমাধানের জন্য বিভিন্ন উপায়ের অনুসন্ধানে সে তার সবিচার চিন্তাকে কাজে লাগায়। এরূপ সবিচার চিন্তা কেবল তার নৈতিক সংকট মোকাবিলায় কাজে লাগে না, বিভিন্ন রকমের পারিবারিক-সামাজিক-পেশাগত সমস্যার সমাধানের কাজে লাগানো যায়।

বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন পেশাগত দায়িত্ব পালন কিংবা গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে আচরণের বিধিমালা তৈরি করেছে। এরূপ আচরণ যথাযথভাবে পালনের জন্য কঠোর নির্দেশনাও থাকে। আবার কিছু প্রতিষ্ঠান নৈতিক শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগও গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে ইউনেস্কোসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোগের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। হেঙ্ক টেন হ্যাভের ২০০৮ সালের প্রবন্ধে উল্লিখিত ইউনেস্কো কর্তৃক গৃহীত নৈতিক শিক্ষা কর্মসূচির বিষয়টিও উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ছাড়া চিকিৎসাসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পেশাজীবীদের নৈতিক বিধিমালা প্রণয়ন ও মেনে চলার মধ্য দিয়ে এদের দ্বারা সর্বোচ্চ মানব কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব বলে দাবি করা হয়। আমার একান্ত বিশ্বাস ছোটদের যদি আমরা তাদের বেড়ে ওঠার সময় নৈতিক শিক্ষা প্রদান করতে পারি তাহলে বড় হয়ে সে এসব পেশাগত বিধিমালা ছাড়াও নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে অনুপ্রাণিত হবে কিংবা এসব বিধিমালার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তার ভিতর থেকেই জাগ্রত হবে। আইনের লঙ্ঘনের ভয়ে নয়, বিবেকের তাড়নায় সে তার পেশাগত দায়িত্ব পালন করবে।

কিছু মন্তব্য

আজকের শিশু আগামী দিনের দেশ-জাতির পরিচালক। যথাযথ শিক্ষার মাধ্যমেই তার ভবিষ্যৎ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে। এ শিক্ষা কেবল নির্দিষ্ট পেশায় পারদর্শী কিংবা দক্ষ হয়ে ওঠার মধ্যে সীমিত রাখলে হবে না। তার বেড়ে উঠার প্রক্রিয়ায় তাকে নৈতিক-সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে যথাযথ শিক্ষা দিতে হবে। ফলে পৃথিবীর দেশে দেশে ছোটদের নৈতিক শিক্ষার বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর প্রাথমিক কাজ পরিবারের সদস্যগণ শুরু করলেও সেসব দেশের ডে-কেয়ার সেন্টারসহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আমাদের দেশে শিশুদের নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও এ ব্যাপারে শিক্ষালয়গুলিতে কার্যকর উদ্যোগ কম। পাঠ্যপুস্তকগুলিতে এর কিছু অংশ সংযোজিত হলেও কেবল কথামালার মধ্যে তা সীমিত রয়েছে। এটা করা অন্যায়, এটা করা যাবে না, কেন করা যাবে না কিংবা করলে কর্তা নিজের কিংবা সমাজের অন্যান্য সদস্যের কী ক্ষতি হতে পারে এসব সম্পর্কিত বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। অনেক বই কিংবা পড়ার চাপে শিক্ষকদেরও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের সুযোগ কিংবা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের সংকট রয়েছে। আমরা জানি শিশুরা অনুকরণ প্রিয়, পুঁথিগত পাঠের চেয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা তার জন্য অধিকতর কার্যকর। স্কুলগুলোতে ছাত্রসংখ্যার আধিক্যের জন্য অনেকেই দাবি করেন সীমিত সংখ্যক শিক্ষক দ্বারা বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থীদের প্রয়োগিক শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব নয়। গতানুগতিক পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষার চেয়ে নৈতিক শিক্ষাকে প্রয়োগধর্মী করতে হবে। আর এরূপ প্রয়োগধর্মী শিক্ষা প্রদানে অভিজ্ঞতা কিংবা প্রশিক্ষণ আমাদের শিক্ষকদের নেই বললেই চলে। ফলে তাঁদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষকদের সহায়তার জন্য নৈতিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা যেতে পারে, যাঁরা শিক্ষকদের এ কাজে সহায়তা প্রদান করবেন।

আমাদের দেশের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে বিদ্যমান নৈতিক শিক্ষার বিভিন্ন পাঠের মধ্যে আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। বিভিন্ন মাধ্যমে শিশুকাল থেকেই যে পাঠ শুরু হয় সেগুলোতে সুনির্দিষ্টভাবে বয়সভিত্তিক নৈতিক শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি সাজাতে হবে। এতে পরিবর্তনশীল সমাজ তথা বিশ্বব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে নৈতিক শিক্ষার বিষয়বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেমন একসময় আমরা ভার্চুয়াল জগতের সাথে পরিচিত ছিলাম না। এখন শিশু থেকে শুরু করে বয়স্করা সকলেই এ জগতে বিচরণ করে। প্রযুক্তির এ জগতে বিচরণের দায়বদ্ধতা কিংবা সচেতনতা শিশু থেকে বয়স্ক অনেকেরই নাই। আমাদের দায়িত্ব শিশুদের এরূপ প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক করা, বাস্তব জগতের মতো ভার্চুয়াল জগতেও যে আমাদের নৈতিকভাবে বিচরণ করতে হবে এ সম্পর্কে সতর্ক করা।

উপসংহার

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দর্শন, বিশ্বাস, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ দ্বারা উন্নয়নের বা এগিয়ে চলার নীতি প্রণয়ন করে। কিন্তু সকল দেশের, সকল জাতির মূল উদ্দেশ্য থাকে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ তথা বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করা। যেখানে মানুষে মানুষে বৈষম্য থাকবে না, সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা হবে, একে অপরের বিপদে-আপদে এগিয়ে আসবে। এরূপ একটি সমাজ তথা বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের নৈতিক জীবনযাপন করতে হবে, সামাজিক দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে শিশুদের যদি সদগুণাবলির শিক্ষা ও অনুশীলনে অভ্যস্ত করা যায় তাহলে এরূপ একটি সমাজ কিংবা বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন বাস্তবায়নের আশা করা যায়।

তথ্যনির্দেশ

Britton, Joanne. 2015. “Young People as Moral Beings: Childhood, Morality and Inter-Generational Relationships” in *Children and Society*, Vol. 29, pp. 495–507.

Halstead, J Mark. 2010. “Moral Education” in Caroline S. Clauss-Ehlers (Ed.), *Encyclopedia of Cross-Cultural School Psychology*, New York: Springer.

Have, Henk ten. 2008. “Unesco’s Ethics Education Programme” in *Journal of Medical Ethics*, https://doi.org/10.1136/jme.2006.019364

Jevernick, Ellen. 2010. *What If Everybody Did That*, Singapore: Marshall Cavendeish.

Marjorie, Montreuil et al. 2018. “Children’s Moral Agency: An Interdisciplinary Scoping Review” in *Journal of Childhood Studies*, Vol. 43, No. 2, pp. 17-30.

Yu Zhao. 2021. “Analysis on the Moral Education Value of Picture Books” in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 615, pp. 707-710.

‘সভ্যতাগতভাবে’ রূপান্তরিত রাষ্ট্রঃ দায় ও দরদের সন্ধানে

কাজী এ এস এম নুরুল হুদা*

মানবজাতি এমন একটি যুগে এসে উপনীত হয়েছে যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনৈতিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয়সহ নানাধরণের অস্তিত্বগত সঙ্কটের কারণে চিরায়ত রাষ্ট্র পরিচালনার সীমাবদ্ধতাগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আইনি আনুষ্ঠানিকতা এবং সার্বভৌমত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা রাষ্ট্র সম্পর্কিত চিরায়ত ধারণাসমূহ সমসাময়িক বিশ্বের গভীর নৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো সমাধান করতে অনেকাংশে ব্যর্থ। যদিও রাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে শাসনব্যবস্থার একটি উপকরণ হিসাবে কাজ করে আসছে, দায় ও দরদের ভিত্তিতে এ প্রতিষ্ঠানের রূপান্তর এমন সঙ্কট মোকাবিলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এ পরিবর্তনটি কেবল রাষ্ট্রের কার্যকারিতা উন্নত করার বিষয় নয়। বরং এটি শাসনব্যবস্থার একটি মৌলিক পুনর্বিচার, যেটি রাষ্ট্রের বৈধতাকে নৈতিক মূল্যবোধ, নৈতিক দায়িত্ব এবং মানবিক দরদের ভিত্তিতে স্থাপন করে।

দায় ও দরদের উপর স্থাপিত এমন ‘সভ্যতাগতভাবে’ রূপান্তরিত রাষ্ট্রের ধারণা রাষ্ট্রের প্রকৃত চরিত্র নিয়ে গভীর দার্শনিক ও নৈতিক ভাবনা থেকে উদ্ভূত। এটি শুধু রাজনৈতিক সংগঠন বা অর্থনৈতিক কাঠামো নিয়ে নয়; বরং সমাজ ও শাসনব্যবস্থা নিয়ে ভাবার ক্ষেত্রে একটি গভীর নৈতিক পরিবর্তনের প্রতিফলন। সভ্যতাগতভাবে রূপান্তরিত রাষ্ট্র দৈনন্দিন শাসনকার্যের প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োগকে ছাড়িয়ে মানব সভ্যতার হাজার বছরের উচ্চতম আদর্শগুলোকে ধারণ করে। এটি মূলত জনগণের সমষ্টিগত নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক পরিপক্কতার প্রতিচ্ছবি।

এ দৃষ্টিভঙ্গিতে রাষ্ট্র কেবল প্রশাসনিক ব্যবস্থা নয় বরং এটি একটি সজীব সংগঠন যা নাগরিকদের মূল্যবোধ ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। এটি এমন একটি রাষ্ট্র, যা ন্যায়বিচার, দায়, দরদ এবং মর্যাদার আদর্শ সমুন্নত রাখে এবং এগুলোকে প্রসারিত করে। বর্তমান রাষ্ট্রগুলোকে প্রায়শই নিরপেক্ষ বা নৈতিকতাহীন সংস্থা হিসাবে দেখা হয়, যা শুধু শৃঙ্খলা বজায় রাখা, আইন প্রয়োগ করা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার দিকে মনোনিবেশ করে। কিন্তু সভ্যতাগতভাবে রূপান্তরিত রাষ্ট্র ভিত্তিগতভাবে নৈতিক। এর বৈধতা শুধু সামাজিক চুক্তি থেকে নয় বরং মানব মর্যাদা ও সমষ্টিগত কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া নৈতিক নীতিমালার সঙ্গে এর সামঞ্জস্যতা থেকেও উৎসারিত।

রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

সভ্যতাগতভাবে রূপান্তরিত রাষ্ট্রের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। আধুনিক রাজনৈতিক তত্ত্বে রাষ্ট্রকে প্রায়শই মানব আচরণ নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সামাজিক জীবনের জটিলতা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসাবে দেখা হয়। হবসিয় দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্র একটি প্রয়োজনীয় মন্দ, যা প্রকৃতির রাজ্যের বিশৃঙ্খলা রোধে ব্যবহৃত হয়, যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুসরণ সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে (Hobbes, 1994)। এমনকি উদার গণতন্ত্রেও রাষ্ট্রকে প্রধানত একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখা হয়, যা ব্যক্তি অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করে এবং নাগরিকদের তাদের স্বার্থ সাধনের সুযোগ দেয় (Rawls, 1999)। কিন্তু সভ্যতাগতভাবে রূপান্তরিত রাষ্ট্র এ ন্যূনতম ভূমিকা অতিক্রম করে।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ইমেইলঃ *huda@du.ac.bd*

এ রাষ্ট্র স্রেফ একটি নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার বদলে নৈতিক ও নীতিগত অগ্রগতির সক্রিয় এজেন্ট হয়ে ওঠে। এটি শুধু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসন করে না; এটি এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে যেখানে নাগরিকরা কেবলমাত্র বস্তুগত নয়, আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবেও বিকশিত হতে পারে (MacIntyre, 1981)। রাষ্ট্র একটি পিতৃত্বসুলভ ভূমিকা নেয়, কিন্তু এটি কর্তৃত্ববাদী নয়; বরং এটি সমাজকে সমষ্টিগত কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে পরিচালিত করে। এটি নিশ্চিত করে যে, ব্যক্তি কর্ম এবং সামাজিক কাঠামো দরদ, ন্যায়বিচার, এবং সমষ্টিগত দায়িত্বের বৃহত্তর মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ধারণাটি প্রাচীন এবং আধুনিক দার্শনিক ঐতিহ্যগুলোর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যেমন কনফুসিয় নীতিতে রাষ্ট্রকে একটি নৈতিক কর্তৃপক্ষ হিসাবে দেখা হয় (Confucius, 2003) এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক দর্শনের আলোচনায় ইতিবাচক স্বাধীনতার মাধ্যমে মানব বিকাশের উপর জোর দেওয়া হয়েছে (Berlin, 2002)।

পথনির্দেশক নীতিস্বরূপ দরদ

সভ্যতাগতভাবে রূপান্তরিত রাষ্ট্রের একটি মূল বৈশিষ্ট্য হলো শাসনব্যবস্থার পথনির্দেশক নীতি হিসাবে দরদের ওপর গুরুত্বারোপ। দরদকে প্রায়শই ব্যক্তিগত বা ধর্মীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, কিন্তু এ মডেলে এটি একটি মৌলিক গণউৎকর্ষতা হয়ে ওঠে। রাষ্ট্র কেবল আইন প্রয়োগ বা সেবা প্রদানের জন্য নয়; এটি গভীর অর্থে তার জনগণের যত্ন নেওয়ার জন্য বিদ্যমান। দরদপূর্ণ শাসনব্যবস্থা এমন নীতিগুলোর মাধ্যমে প্রকাশিত হবে, যা সমাজের সবচেয়ে দুর্বল সদস্যদের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়। সমাজকল্যাণ, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং আবাসনকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উপায় হিসাবে নয় বরং নৈতিক কর্তব্য হিসাবে দেখা হবে। রাষ্ট্রের বৈধতা তার সেই সামর্থ্য থেকে আসে যা এটি নিশ্চিত করতে পারে যে কাউকে বঞ্চিত করা হবে না এবং প্রতিটি ব্যক্তিকে তার অন্তর্নিহিত মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সাথে বিবেচনা করা হবে (Nussbaum, 2007)।

এটি অনেকভাবে দার্শনিক মার্থা নুসবামের সক্ষমতা দৃষ্টিকোণের সম্প্রসারণ। নুসবাম বলেন যে ন্যায়সঙ্গত সমাজ হলো এমন একটি সমাজ যা নিশ্চিত করে যে প্রতিটি ব্যক্তির বিকশিত জীবনযাপনের ক্ষমতা রয়েছে (Nussbaum, 2000)। এতে শুধু বস্তুগত কল্যাণ নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং নিজের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ অন্তর্ভুক্ত। সভ্যতাগতভাবে রূপান্তরিত রাষ্ট্র এ দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করলেও এটি এর থেকেও আরেকটু বেশি কিছু। এটি শুধু নাগরিকদের বিকশিত হওয়ার সুযোগ প্রদান করবে না, এটি তাদের মধ্যে সমষ্টিগত দায়িত্ববোধও সৃষ্টি করবে। রাষ্ট্রের ভূমিকা শুধু নীতি বাস্তবায়ন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং এটি সমাজের চরিত্র ও নৈতিক সংস্কৃতি গঠনেও ভূমিকা রাখবে (Taylor, 2018)।

দায় এবং আন্তঃসম্পর্ক

দরদ সম্পর্কিত আলোচনা সভ্যতাগতভাবে রূপান্তরিত রাষ্ট্রের আরেকটি মূল বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে: দায়ের ধারণা। আধুনিক রাজনীতিতে দায়কে প্রায়শই সীমিত অর্থে গ্রহণ করা হয়: সরকার শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, নাগরিকরা আইন মেনে চলতে এবং ব্যক্তিরা তাদের সফলতা বা ব্যর্থতার জন্য দায়বদ্ধ। তবে সভ্যতাগতভাবে রূপান্তরিত রাষ্ট্রে দায়কে অনেক গভীর এবং পূর্ণাঙ্গভাবে বোঝা হয়। এটি কেবল আইনগত দায়িত্ব বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখার কথা বলে তা নয়; এটি আমাদের আন্তঃসম্পর্ক এবং ব্যক্তিগত উন্নতি ও সমষ্টিগত কল্যাণের সম্পর্ককে বোঝার সাথেও সম্পর্কিত।

এ ধারণাটি আফ্রিকার উবুনটু দার্শনিক ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত, যা বলে "আমি আছি কারণ আমরা আছি।" এটি কমিউনিটারিয়ান রাজনৈতিক তত্ত্বের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ, যা কমিউনিটি এবং শেয়ারকৃত মূল্যবোধকে ব্যক্তি পরিচয় এবং দায়িত্ব গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে তুলে ধরে (Etzioni, 1993)। সভ্যতাগতভাবে রূপান্তরিত রাষ্ট্র এক ধরণের পারস্পরিক দায়িত্ববোধ তৈরি করবে, যেখানে নাগরিকরা নিজেদের কল্যাণকে অন্যদের কল্যাণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত মনে করবে। এ দায়বোধ ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সমাজের সব স্তরে ছড়িয়ে পড়বে এবং এমন একটি সংস্কৃতি তৈরি করবে যেখানে অন্যদের যত্ন নেওয়া কেবল একটি ব্যক্তিগত উৎকর্ষতা নয় বরং একটি নাগরিক দায়িত্ব।

বাংলাদেশের ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান: নৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের দাবি

বাংলাদেশের ২০২৪ সালের শিক্ষার্থী-জনতা অভ্যুত্থানকে সভ্যতাগত পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার একটি প্রকাশ হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে শুরু হওয়া এ আন্দোলন খুব দ্রুত রাষ্ট্রের নৈতিক ব্যর্থতার ব্যাপক সমালোচনায় পরিণত হয় (Huda, 2024a)। সহিংসতা, দমন এবং শিক্ষার্থী-জনতার হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিফলিত হওয়া সরকারের নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়া তৎকালীন শাসনের মধ্যে দায় ও দরদের অভাবকে তুলে ধরে। এ আন্দোলন কেবল রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি ছিল না। এটি এমন একটি রাষ্ট্রের দাবি ছিল, যা নাগরিকদের মর্যাদা এবং অধিকারকে সমুন্নত রাখবে, তাদের প্রতি দরদী হবে, এবং তাদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে দায়িত্ব পালন করবে।

অবশ্যই, এ দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়িত করার পথে কীভাবে এগোতে হবে তা একটি বড় চ্যালেঞ্জ (Huda, 2024b)। সভ্যতাগত পরিবর্তন অত্যন্ত কঠিন এবং এটির জন্য শুধু রাজনৈতিক সংস্কার বা শাসন পরিবর্তনের চেয়ে অনেক বেশি কিছু প্রয়োজন। এটি সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক পরিবর্তনের একটি গভীর প্রক্রিয়া, যা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এবং নাগরিকদের মননে এবং মস্তিষ্কে হতে হবে। এ ধরণের পরিবর্তন এক রাতেই অর্জিত হয় না; এটির জন্য দরকার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, সংলাপ এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা ও সমাজে ব্যক্তির দায়িত্ব পুনর্বিবেচনা করার জন্য সমষ্টিগত প্রতিশ্রুতি।

সভ্যতাগতভাবে রূপান্তরিত রাষ্ট্রের কল্পনা করতে গেলে এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এমন একটি রাষ্ট্র স্থির বা ইউটোপিয় হবে না। এটি গতিশীল হবে, স্থিরচিত্তে পরিবর্তনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে (Sen, 1999)। এটি তার নাগরিকদের উপর মহৎ জীবন সম্পর্কিত একটি একক দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেবে না বরং একটি বহুত্ববাদী পরিবেশ তৈরি করবে যেখানে বিভিন্ন জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারা বিকশিত হতে পারবে (Rawls, 1999)। এটি মনে রাখতে হবে যে, রাষ্ট্র শুধু একটি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ নয়, এটি জনগণের একটি সতেজ প্রকাশ, যার সত্যিকার শক্তি এবং বৈধতা আসবে মানুষের মধ্যে ভালবাসা, দরদ, ন্যায়বিচার, এবং সমষ্টিগত দায়িত্বের চেতনায় (Nussbaum, 2011)।

উপসংহার

সভ্যতাগতভাবে রূপান্তরিত রাষ্ট্র মানব শাসন সম্পর্কিত সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এটি এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে নাগরিকদের বস্তুগত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ হয়, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তির মর্যাদা সম্মানিত হয়, এবং যেখানে স্বার্থের সংকীর্ণতার পরিবর্তে সাধারণ মঙ্গলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এ রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা এমন একটি উত্তরণের পথ নির্দেশ করে, যা আরও ন্যায়সঙ্গত, সমতাভিত্তিক এবং সহানুভূতিশীল বিশ্বের দিকে আমাদেরকে এগিয়ে

নিয়ে যেতে পারে। এটি এমন একটি রাষ্ট্র যা প্রতিফলিত করে যে দরদ এবং একে অপরের প্রতি গভীর দায়িত্ববোধ দ্বারা পরিচালিত হলে ব্যক্তি ও জাতি উভয় হিসাবেই মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ আমরা অর্জন করতে পারি। তাই রাষ্ট্রকে দায় এবং দরদের ভিত্তিতে একটি সভ্যতাগত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা কেবল একটি দার্শনিক আদর্শ নয়, জরুরি বাস্তব প্রয়োজনও বটে।

তথ্যসূত্র

Berlin, I. (2002). *Liberty*. Oxford University Press.

Confucius. (2003). *The analects* (Trans. Edward Slingerland). Hackett Publishing Company.

Etzioni, A. (1993). *The spirit of community: The reinvention of American society*. Touchstone.

Hobbes, T. (1994). *Leviathan*. Hackett Publishing Company.

Huda, K. A. S. M. (2024a, September 30). “Bangladesh’s July-August uprising: A student movement that transcended quota reform.” *Countercurrents*. https://countercurrents.org/2024/09/bangladeshs-july-august-uprising-a-student-movement-that-transcended-quota-reform/

Huda, K. A. S. M. (2024b, October 2). “The next challenge for Bangladesh’s 2024 uprising.” *E-International Relations*. https://www.e-ir.info/2024/10/02/opinion-the-next-challenge-for-bangladeshs-2024-uprising/

MacIntyre, A. (1981). *After virtue: A study in moral theory*. University of Notre Dame Press.

Nussbaum, M. (2000). *Women and human development: The capabilities approach*. Cambridge University Press.

Nussbaum, M. (2007). *Frontiers of justice: Disability, nationality, species membership*. Belknap Press.

Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities: The human development approach*. Harvard University Press.

Rawls, J. (1999). *A theory of justice*. Harvard University Press.

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

Taylor, C. (2018). *The ethics of authenticity*. Harvard University Press.

মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্ব

মুর্শিদা রহমান*

বিংশ শতাব্দীর সর্বাধিক আলোচিত সমাজদার্শনিক হিসেবে কার্ল মার্কসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জার্মান দর্শন, বৃটিশ অর্থনীতিশাস্ত্র এবং ফরাসি বিপ্লবের ঐতিহাসিক বিচারে মার্কসবাদ পুষ্ট হয়েছে। প্লেটো, এরিস্টটল থেকে হেগেল পর্যন্ত চিন্তানায়করা যে দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্বসৃষ্টি ও সৌন্দর্যসৃষ্টির ব্যাখ্যা করেছেন কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস সেগুলোকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সাহায্যে বিচার করে তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ কারণেই লেনিন বলেছেন, সর্বহারা সংস্কৃতি আকাশ থেকে পড়েনি। সুতরাং বলা যায় যে শিল্প ও নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রে যেসব শিল্পী, বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকরা নাম কিনেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিল মার্কস। মার্কসীয় নন্দনত্ত্বে শিল্পের শৈল্পিক অনুভবের বাহ্যিক প্রকাশকে একজন শিল্পীর যেভাবে ধারণ করা উচিত তারই বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

কার্ল মার্কসের মূল বিষয় ছিল সমাজব্যবস্থা। তাঁর মতে, সমাজব্যবস্থার মধ্যে দুটি বিষয় থাকে: উপরিকাঠামো (superstructure), এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি (economic base)। উপরিকাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ধর্ম, দর্শন, নৈতিকতা, আইন, রাষ্ট্র, শিল্পকলা ও সংস্কৃতি। আর অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর: উৎপাদিত শক্তি এবং উৎপাদন ব্যবস্থা।

উৎপাদন শক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো শ্রমিক বা মেহনতি মানুষ এবং উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে শিল্পকারখানা বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান। মার্কস পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার কথা না বলে বরং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। কারণ সমাজতন্ত্রে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একটি শ্রেণীহীন বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে। শিল্প যেহেতু সমাজের উপরিকাঠামোর অঙ্গ, তাই এটি সমাজের মতাদর্শের অঙ্গ। সুতরাং শিল্পকে বুঝতে গেলে সমগ্র সামাজিক প্রক্রিয়াকে বুঝতে হবে।

মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের প্রেক্ষাপট

প্রাচীন গ্রীসের নন্দনতত্ত্বের প্রকৃতি ও তার অন্তর্গত জীবজগত বিশেষ করে মানুষ এবং প্রকৃতি মনুষ্যসৃষ্ট শিল্পকলা ও সৌন্দর্য সৃষ্টির পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট আলোচনা প্লেটো বা এরিস্টটলে পাওয়া যায় না। এরিস্টটল বস্তুবাদের অত্যন্ত নিকটে এসেও শিল্পকলাকে 'পরমাত্মা,' 'বিশ্ববিবেক ভাবনা' বা 'ঈশ্বরের অভিব্যক্তি' নামে অভিহিত করেছেন। প্লেটোর মতে দার্শনিক ও কবিদের মধ্যে কে জ্ঞানের ভাণ্ডারের অধিকারী হবেন এই ধরনের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নন্দনতত্ত্বের জন্ম। সক্রেটিস সৌন্দর্যকে 'আলোর' সঙ্গে তুলনা করেছেন যা বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রকাশ করে এবং তাকে জানার শক্তি দেয়। সুতরাং বলা যায় প্রাচীন যুগে প্রতিটি সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করা কেবল নন্দনত্ত্বের বিষয় ছিল না বরং তা সামাজিক উপযোগিতার মানদণ্ডে বিচার করা হতো। কারণ প্লেটোর মতে, "সৌন্দর্যজাত আনন্দ যেন নির্মল আনন্দ হয়।" গতানুগতিকভাবে প্লেটোর সময়কাল থেকে শিল্পভাবনা সম্পর্কে যে ধারণা মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল মার্কস তাকে খণ্ডন করেছিলেন। তিনি শিল্পকে সামাজিক ভাবনার আদর্শে ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষের শিল্পী সত্তা যে সমাজনীতি অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল এই কথা প্রথম তত্ত্ব সহযোগে ব্যাখ্যা

* প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ইমেইল: *murshidatonny89@gmail.com*

করেছিলেন তিনি। তাই বিশ্বসাহিত্যে মার্কসবাদ বা মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব নামে একটি নতুন তত্ত্বের সূত্রপাত হয়েছে। মার্কসের বক্তব্যকে সহজভাবে রাশিয়ার মার্কসবদী দার্শনিক ও সমালোচক প্লেখানভ তাঁর *শিল্প ও সমাজজীবন* নামক পুস্তকে ব্যক্ত করেছেন। প্লেখানভ বলেছেন, "যুগের সামাজিক মানস সে যুগের সামাজিক সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এটি অন্যান্য ক্ষেত্র অপেক্ষা সাহিত্য ও শিল্পের জগতে বেশ প্রকটিত।"[১]

কার্ল মার্কসের নন্দনতত্ত্ব

মার্কস ও এঙ্গেলসের নন্দনতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা দিয়ে মার্কসীয় মতবাদের সূত্রপাত। মার্কস তাঁর বন্ধুবর এঙ্গেলসকে নিয়ে 'সোনাঝড়া দর্শনের' কেবল যে কড়া সমালোচনা করেছেন তা নয়, তিনি "অলস জীবনের কর্মহীন স্রোতপথে যে শিল্পের সৌন্দর্য শতদল প্রস্ফুটিত হয় না সে কথা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষনা করেছেন।"[২] সোনাঝড়া দর্শন হলো সেই দর্শন যার "শিল্পএষণা ও শৈল্পিক প্রকাশ" আছে; কিন্তু মেহনতি মানুষের "কৃষ্টিমূলক কীর্তির মূলে যে পরিশ্রম রয়েছে" সে কথা বলে না। এই সোনাঝড়া দর্শন নির্মাণ ও প্রচার করেছিলেন হিউম, রাসেল ও ম্যূর যা এখনো বর্তমান। মার্কসের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন এঙ্গেলস। এদের উভয়েরই চেতনায় যথেষ্ট মিল ছিল। নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে এরা কোনো আলোচনা গ্রন্থ রচনা করেননি। কিন্তু বিভিন্ন গ্রন্থে বা চিঠিপত্রে নন্দতত্ত্ব বা শিল্পতত্ত্বের বিভিন্ন উপাদানগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। মার্কসের নন্দনতাত্ত্বিক ধারণা বস্তুতান্ত্রিক বাস্তবতা বিবর্জিত বললে সত্যের অপলাপ করা হবে না; অপরপক্ষে এঙ্গেলস বাস্তবতা তত্ত্বে ঘোরতর বিশ্বাসী ছিলেন।[৩]

মার্কসের মতে মানুষ প্রকৃতির একটি অংশমাত্র হয়েও আত্মরক্ষা ও বিকাশের নিয়মে প্রকৃতির শক্তিকে মোকাবেলা করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তার একাংশের নাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা। অন্য অংশের নাম শিল্পকলা। সুতরাং একদিক দিয়ে বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা ও সৌন্দর্যতত্ত্বের বিষয়ীভূত। সৌন্দর্যকে মানুষ নিয়মাবলী অনুসারেই সৃষ্টি করে। মার্কসবাদীরা তাঁদের মূল বক্তব্যে বলেছেন, "যদি কেউ শৈল্পিকভাবে জীবনকে দেখে থাকেন তবে জীবনের শুরু থেকেই তাকে গঠনমূলক শিল্পচর্চায় নিয়োজিত থাকা আবশ্যক।"[৪]

আবেগ ও শিল্প নির্দেশনার ওপর ভিত্তি করেই পৃথিবীতে চলমান শিল্পের শ্রেণীবিভাগ করা হয় এবং অবকাঠামোগতভাবে শিল্পীকে শৈল্পিক প্রকাশনার নান্দনিক রূপ ত্বরান্বিত করে। আর গঠনগত দিক লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি শিল্পেরই প্রকাশের একটি ধারাবাহিক নিয়ম আছে। জাগতিক জীবনের বাস্তব শিল্পগুলোর ওপর নির্ভর করেই শিল্পী তাঁর জীবন পরিচালিত করে থাকেন। পৃথিবীতে সকল মানুষ কোনো না কোনোভাবে শিল্পী। আমরা অনেক সময় নিজের অজান্তে নান্দনিক শিল্প তৈরী না হলেও শিল্পচর্চা করে থাকি। রন্ধনশিল্প, হস্তশিল্প, যন্ত্রশিল্প নানা বৈচিত্র্য বৈভব আমাদের জীবনের সাথে সব সময় জড়িয়ে আছে। তাই শৈল্পিক নির্দেশনা না জেনেও আমরা শিল্পী হয়ে থাকি। শিল্প ও নন্দনতত্ত্বের আভিধানিক যে অর্থ সেটি মার্কসীয়রা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। শিল্পের সুন্দর-অসুন্দর, অধিকার-অনধিকার, রূপ-কৈবল্যবাদ, সত্যম-শিবম-সুন্দরম সবকিছুরই নান্দনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন মার্কসবাদীরা। পরিপূর্ণ শৈল্পিক অনুভব থাকা সত্ত্বেও একজন শিল্পীর শিল্পকর্ম অসুন্দর হতে পারে। এ বিষয়ে মার্কস তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। কারণ সময়ের পরিবর্তনে বা মানবিক কারণে অনেক ক্ষেত্রে শিল্পীর শিল্প তৈরীর ক্ষেত্রটি কিছুটা হলেও ম্লান হতে পারে। কিন্তু এতটুকুর জন্য একজন পরিপূর্ণ শিল্পীর শিল্পকর্মকে অসুন্দর না বলে সুন্দরই বলতে হবে। ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর এই শব্দগুলো সবসময়ই আমাদের মধ্যে ধারণ করি। কেননা আমাদের সামাজিক বন্ধন, বিবর্তিত জীবন ও প্রাদেশিক পার্থক্য থাকলেও এই শব্দগুলো সকল ক্ষেত্রেই প্রচলিত। তাই শৈল্পিক জীবন, চেতনা,

প্রেষণা, অনুভব ও জীবন দর্শনের সার্বিক পরিকল্পনায় যে আমরা শিল্পকে ধারণ করতে পারি। শিল্পের নান্দনিক বিষয়গুলো তখনই মার্কসের মতবাদ বা শিল্প দর্শন হিসেবে শৈল্পিকভাবে আমাদের মধ্যে আমরা ধারণ করতে পারবো।

মার্কসবাদীরা শিল্পের জন্য শিল্পতত্ত্বকে খণ্ডন করেন

মার্কসীয় দৃষ্টিতে শিল্পের মূল্যায়ন করা হয় শিল্পে বাস্তব সমাজজীবন কতখানি প্রতিফলিত এবং সমাজজীবনের উন্নয়ন সাধনে শিল্প কতখানি ভূমিকা গ্রহণ করে তার উপর। মার্কসের মতে, সমাজজীবনের সূচনা থেকেই শিল্পের জন্ম এবং শ্রম বা কর্মের সঙ্গেই শিল্প প্রথমাবধি একান্তভাবে জড়িত। মানুষের সৌন্দর্যচেতনা সমাজজীবনেরই দান। পারিপার্শ্বিক জগতে, জীবনে ও শিল্পে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা মানুষ লাভ করেছে কর্মের মধ্য দিয়েই। সুতরাং বাঁচার তাগিদ ও সৌন্দর্যচেতনা এ দুটি কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। শিল্পের দায়িত্বই হচ্ছে বাস্তব জগৎ ও কর্মময় জীবনের সৌন্দর্যকে উদ্‌ঘাটিত করে শিল্পে তা প্রতিফলিত করা ও মানুষের সৌন্দর্যবোধকে পুষ্ট করা। জীবনের সঙ্গে শিল্প এতই জড়িত যে বিশুদ্ধ শিল্প (pure art) বা শিল্পের খাতিরে শিল্প (art for art's sake) এই সব ধারণাকে মার্কসবাদী দৃষ্টিতে স্বীকার করা যায় না। ধনতন্ত্রের আশ্রয়পুষ্ট বুর্জোয়া শিল্পকে মার্কসবাদী দৃষ্টিতে হেয় করে দেখা হয়, কেননা তা দেশের অগণিত শ্রমিক শ্রেণির প্রতি মানুষকে উদাসীন করে তোলে এবং কায়েমী পুঁজিবাদীর ভাববিলাসের খোরাক জোগায়। মার্কসবাদী সমীক্ষায় বুর্জোয়া শিল্প সম্বন্ধে আরো বলা হয়েছে যে, এই শিল্প মানুষকে নৈরাশ্যবাদী তথা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে তোলে, মানুষকে মৌলিক জীবনসত্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নেতিবাচক মনোবৃত্তি গড়তে সহায়তা করে এবং নিরর্থক রূপবাদের ধারণায় পৌঁছে দিয়ে মানুষের সৌন্দর্যবোধকে জীবন বিচ্ছিন্ন করে তোলে। অবশ্য একথাও স্বীকার করা হয়েছে যে, বুর্জোয়া শ্রেণি থেকেই এমন অনেক শিল্পী ও সাহিত্যিক জন্মেছেন যাঁরা রূঢ় বাস্তবের প্রভাবে চরম শিক্ষালাভ করেছেন এবং ধনতন্ত্রের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে জনসমাজের স্বার্থেই তাঁদের শিল্প ও সাহিত্যকে উপস্থাপন করেছেন। বাস্তবনিষ্ঠতা, গভীর জীবনবোধ, সাম্যচেতনা ও মুক্তির স্বপ্ন এইগুলো হচ্ছে তাদের শিল্প সাহিত্যের লক্ষণ। কিন্তু মার্কসবাদে যুগোত্তীর্ণ উৎকৃষ্ট ক্লাসিক শিল্প সাহিত্যকে হেয় করার কোনো মনোভাব ছিল না। মার্কসবাদীদের নীতি ছিল সকল শিল্পী, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ যাতে তাদের প্রতিভাকে পূর্ণভাবে বিকশিত করবার সুযোগ পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা। তাছাড়াও মার্কসবাদী শিল্পতত্ত্বের দাবি ছিল, সমাজের সকলের সূক্ষ্ম বৃত্তিসমূহকে বিকশিত করতে তাদের শিল্প সাহায্য করবে।

সমাজবাদী শিল্পের লক্ষণগুলোকে দেখিয়ে লেনিন বলেছিলেন,

> Art belongs to the people. Its roots should be deeply implanted in the very thick of the labouring masses. It should be understood and loved by these masses. It must unite and elevate their feelings, thoughts and will. It must stir to activity and develop the art instinct within them.[৫]

মার্কসবাদী দর্শনে বস্তুবাদ ও ভাববাদ

শিক্ষাজগতে শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মার্কসবাদী দর্শনে বস্তুবাদ ও ভাববাদের দ্বন্দ্বকে কাটিয়ে শিল্পকলা তথা সৌন্দর্যদর্শন বস্তুবাদকেই গ্রহণ করেছে। ভাববাদী দৃষ্টিতে সৌন্দর্যদর্শনকে আধ্যাত্মিক স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। অপরদিকে, বস্তুবাদী সৌন্দর্যদর্শনের প্রকৃতি ও মানব এ দুয়ের বাইরে আর কোনো কিছুর অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না এবং শিল্পের মূল্যায়নের প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। শিল্পে আধার বা রূপ এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে বিষয়বস্তুকেই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। মার্কসবাদী দর্শনে যান্ত্রিক সভ্যতাকে মানুষের সুকুমার বৃত্তির পরিপন্থী বলে মনে করা হয় না। কারণ শ্রম ও সৌন্দর্যবোধ একই সঙ্গে বর্তমান।

শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে কার্ল মার্কসের ধারণা

কার্ল মার্কসের *Economics and Philosophical Manuscripts* (1844) গ্রন্থে প্রথম শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তিনি এই গ্রন্থে সাহিত্যে বাস্তবতার কথা বলেছেন। আর বাস্তবতা গড়ে ওঠে মানুষকে কেন্দ্র করে। মানুষের মনের ক্রিয়াশীলতা থেকে সমাজবোধ, চেতনা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। আর উক্ত চেতনাই মানুষকে শিল্প সৃষ্টিতে সহায়তা করে এবং এই চেতনার সাহায্যেই মানুষ সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে। মার্কসের সঙ্গে যৌথ প্রচেষ্টায় এঙ্গেলস লিখেছিলেন *The Holy Family*। এখানে তাঁরা শিল্পের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। তাঁদের মতে শুধুমাত্র কল্পনা, আবেগ, অনুভূতি, সৌন্দর্য দিয়েই শিল্প সৃজন সম্ভব নয় বরং মার্কসবাদে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছিল চোখে দেখা বাস্তব বিষয়। মার্কসীয় নন্দনতাত্ত্বিক ধারণাকে এক কথায় 'হিস্টোরিসিজম' বা ইতিহাসবাদ কথাটির দ্বারা সূচিত করা হয়ে থাকে।[৬]

তাঁর মতে, মানুষের সাংস্কৃতিক কর্মকুশলতার নিদর্শনই হলো শিল্প। সামাজিক-ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারার মধ্য দিয়ে মানুষ আপনার অন্তরস্থ সত্যটুকুকে উপলব্ধি করে এবং সেই উপলব্ধির পথে শিল্প হলো একটি পদক্ষেপ।[৭] আবার বলা যায় শিল্পকলা হলো মানুষের মধ্যকার এমন একটি সাংস্কৃতিক কৃতি যা মানুষের অন্যান্য কর্মকুশলতাকেও প্রভাবিত করে। মানুষের নৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও শিল্প চেতনার রূপান্তর ঘটায়। এই ধরনের পারস্পরিক প্রভাবের জোয়ার ভাটা মনুষ্য সমাজ গঠনে আদিকাল থেকেই চলে আসছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। কোন একটি বিশেষ কালের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের ভিন্নধর্মী ক্রিয়ার পারম্পর্যকে প্রভাবিত করার যে তত্ত্ব এটিকে যেমন মার্কস স্বীকার করেছেন তেমনি নিরবধিকালের পটভূমিকায় মানুষের বিভিন্ন ধরনের অতীত কীর্তিকলাপ যে ভবিষ্যৎকালের সাংস্কৃতিক কৃতিকে প্রভাবিত করে, এ কথাও বলেছেন অসংকোচে। এই দুরূহ তত্ত্বের ব্যাখ্যায় মার্কস Synchronic ও Diachronic দুইটি প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। সমাজশ্রেণীর অভ্যন্তরীণ সাধারণ দ্বন্দ্ব ও আনুষঙ্গিক বিবর্তন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে আদর্শবাদী রূপ দেয়। এই রূপান্তরিত দৃষ্টিভঙ্গি আবার মানুষের শিল্পকর্ম এবং নন্দনতাত্ত্বিক ধারণাকে ক্রমান্বয়ে প্রভাবিত করে। শিল্পের উৎপত্তি এবং শিল্পের ভূমিকা সম্বন্ধে মার্কসের সমস্ত নন্দনতাত্ত্বিক বিচারই ইতিহাস আশ্রিত। অর্থাৎ ইতিহাসের পটভূমিতেই শিল্পের মূল্যায়নের কথা মার্কস বলেছেন।

'Homo Faber' অর্থাৎ মেহনতি মানুষ 'Homo Aesthetics' অর্থাৎ শিল্পী মানুষে রূপান্তরিত হবে। আর শিল্পী জীবনের সবটুকু সম্ভাব্যতা সত্য হয়ে উঠবে। মানুষের শিল্পকর্ম তার অন্যান্য নানাবিধ ক্রিয়া-কলাপের দ্বারা অংকিত। মার্কসের মতে মানুষের এই শিল্পএষণা ও শৈল্পিক প্রকাশের আপেক্ষিক সম্ভাব্যতা রয়েছে। তাঁর ইতিহাসবাদ শিল্পের এই আনুপাতিক স্ববশ্যতাকে স্বীকার করেছে। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ও তাঁর মৌল ভাবনার সঙ্গে শিল্পের একটি নিগূঢ় সম্পর্ক কার্ল মার্কস স্বীকার করেছেন। মার্কসবাদীদের নন্দনতাত্ত্বিক ধারণা তিনটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলো হলো:

ক) মানুষের সকল কৃষ্টিমূলক কৃতির মূলে যে পরিশ্রম রয়েছে সেই পরিশ্রমটুকু,

খ) জাতির অগ্রগতির জন্য যে সামাজিক বিপ্লব মূলতঃ দায়ী সেই বিপ্লবের কালটুকু, এবং

গ) কমিউনিজমকে লক্ষ্য হিসেবে অগ্রগণ্য করে তাঁর ঐতিহাসিক গতিশীলতার পূর্ণচ্ছেদের বাস্তব রূপায়ন যেখানে এই উভয়বিধ ধারাণাটুকু থাকবে।

এছাড়াও মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় কার্ল মার্কস কায়িক পরিশ্রমকে শিল্প চেতনার মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলেছেন। অলস ও কর্মহীন জীবনে শিল্পের সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয় না। এ প্রসঙ্গে ফরাসি মনীষী রঁলার

কথা স্মরণ করা যায়। মার্কস বলেন সমাজে পারস্পরিক চেতনাবোধ থেকে সৌন্দর্য বিস্তার লাভ করে এবং শিল্পচর্চা ও শিল্পসাধনা বিকশিত হয়। মার্কস আরও বলেন কালের বিবর্তনে সমাজব্যবস্থার মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল এবং দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও মানুষ আদর্শনিষ্ঠ জীবনযাপন করেছে এবং শিল্পচর্চা করেছে এবং তাদের শিল্পকলায় নান্দনিকতা ছিল। তিনি বলেছেন Homo Faber থেকে Homo Aesthetics এ রূপান্তরিত হতে হবে। সুধীর কুমার নন্দী তাঁর *নন্দনতত্ত্ব* বইটিতে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের তিনটি স্তরের কথা বলেছেন: পরিশ্রম, সামাজিক বিপ্লব, এবং কমিউনিজম বাস্তবায়ন।

সুধীর কুমার নন্দী মার্কস যে মেহনতি মানুষের কথা বলেছেন সেই প্রসঙ্গে বলেন, মেহনতি মানুষকে সুযোগ দেওয়া হলে তাদের মধ্যেও শিল্পচর্চার বিষয়টি জাগ্রত হবে। সুতরাং মার্কস বলেছেন, শৈল্পিক চেতনাবোধ মেহনতি, পরিশ্রমী মানুষের মধ্যে উদ্দীপনা জাগায় সংগ্রামী বিপ্লবী মানুষে রূপান্তরিত হবার জন্যে। এঁদের মনমানসিকতায় ফসলিত হয় বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তনের আদর্শে।[৮]

সুতরাং মার্কসবাদ সমাজ ও জীবনকে একটি বিশেষ কাঠামোর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে চায়। যে কাঠামো হবে এমন সেখানে কোনো শ্রেণীবৈষম্য থাকবে না। অর্থনৈতিক কাঠামো এমন হবে যেন সবাই তার কাজ অনুযায়ী মূল্য পায়। অর্থাৎ মার্কসবাদে পরিবার ও দৈনন্দিন জীবনের একটি কাঠামোর কথা বলা হয়। তাছাড়াও বলা যায় যে মার্কর্সবাদে অতীন্দ্রিয়তার কোনো স্থান নেই। শিল্পকে মার্কস বিশ্লেষণ করেছেন দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে। মার্কসবাদীরা সমাজের সঙ্গে শিল্পকে একাত্ম করে ভেবেছেন এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে মার্কসবাদী শিল্পভাবনা সম্পর্কযুক্ত। তাছাড়াও অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গেও মার্কসবাদী শিল্পভাবনা সম্পর্কিত।

উপসংহার

মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্ব প্রচলিত ভাববাদী নন্দনতাত্ত্বিক ধারণা থেকে ভিন্নমত পোষণ করে এবং নন্দনতত্ত্বের সামাজিক ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করে। শিল্পের প্রকৌশল দিকের সমালোচনার বিরুদ্ধে বলা যায় শিল্পের মধ্য দিয়ে নৈতিকতা প্রকাশ পেতে পারে। সুতরাং বলা যায়, মার্কসবাদীরা শিল্পের সাথে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিককে সম্পৃক্ত করে শিল্পের ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডকে ফলপ্রসূ করেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা*, ‘হেগেল, মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন,’ প্রণবকুমার নায়ক, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১৬১।

২. ড. এ. কে. এম. সালাহউদ্দিন, *নন্দনতত্ত্ব*, গ্রন্থ কুটির, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৮৫।

৩. ড. রামদুলাল রায়, *নন্দনতত্ত্ব*, সুরভী পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৮৬।

৪. ড. প্রদীপ কুমার নন্দী (সম্পা.), *শিল্প ও নন্দনতত্ত*, ‘Marxist, Hanslick, ও Frued এর শিল্পদর্শন,’ ড. প্রদীপ কুমার নন্দী, অবসর, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৫২৭।

৫. V. G. Afanasyev, *Marxist Philosophy*, Progress Publishers, Moscow, 1980, p. 388.

৬. ড. রামদুলাল রায়, *নন্দনতত্ত্ব*, পৃ. ১৮৭।

৭. সুধীর কুমার নন্দী, *নন্দনতত্ত্ব*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৩০০।

৮. ড. এ. কে. এম. সালাহউদ্দিন, *নন্দনতত্ত্ব*, পৃ. ৯২।

Examining Modern Methods of Self-Discovery via the Lens of *Sophie's World*: Exploring Identity in the Digital Age

Jannatul Ferdous Mita[*]

One of the biggest mysteries at the core of human existence is entity—who are we, how did it come to be this way and where do our interactions with a world outside perceive us? These are a few of the questions almost everyone must ask themselves. Through *Sophie's World*, Jostein Gaarder explores this thirst for meaning and philosophical investigation which binds humanity. Through this, readers learn of the "natural urge" for philosophy portrayed through Sophie, who receives cryptic letters questioning her existence and prompting them to question: Who is she (Gaarder, 1991, p. 2), a plight experienced by all at least once in their life.

The widespread use of technology has undoubtedly changed how people think. While it allows people unprecedented access to information, it also limits deeper engagement with that information. Technology favors surface-level comprehension since frequent messages, apps, and digital platforms compete for our attention, leaving little chance for undistracted reflection. In some ways, technology fills the mental space that would otherwise be occupied with questions about existence, identity, and purpose. That is to say, technology creates a paradox where individuals feel more connected yet increasingly isolated from their true selves. Turkle discusses this phenomenon, where the constant interaction with digital platforms creates a detachment from deeper self-reflection and authentic relationships (Turkle, 2011).

When answers appear to be easily found online, thinking about the problem and giving it time to grow could take a back seat. As a society, we no longer rely on introspective thinking but rather on quick, practical responses—all because of technological progress. As a contemporary college student, Sophie's early interest in philosophical questions—sparked by mysterious letters—stands in stark contrast to the student trend toward quick fixes. This change exemplifies a larger pattern whereby young people's reactions to uncertainty are shaped by technology, leading them to reject careful deliberation in favor of quick fixes or even blasé skepticism. While we explore these ideas, it is crucial to find out how technological immersion, economic progress, and social variables impact the interest in philosophy among young people today. It would appear that, particularly among university students, the modern connection with philosophy is radically different. The question "Who

[*] Lecturer, Department of Philosophy, University of Dhaka. Email: *jfmita01@gmail.com*

are you?” appears in an enigmatic letter that a student might receive and react with curiosity or cautiousness. Instead of thinking about how they came to be, they are more likely to use technology to find out who sent the letter or turn it in to the official. Unfortunately, in today’s fast-paced world, practical, quick fixes tend to trump deeper philosophical consideration. This modification indicates this. Instead of prompting a personal exploration of one’s identity, this kind of question could make people worried about their privacy or security, diverting their focus from within to outside forces.

Philosophical participation among this generation is heavily impacted by economic and social factors, which place a premium on professional identity and financial achievement. Developing a strong sense of economic identity—one that is linked to success in the workplace, stable income, and respect from peers—is a priority for many young people today. The pressures of living in a capitalist, competitive culture that values achievement, production, and material success above self-reflection and intellectual pursuits provide this drive. Conforming to Bauman’s idea of shifting identities in a consumer-driven society, chances for deep philosophical thought are frequently eclipsed by quick, practical solutions in today’s technologically sophisticated society (Bauman, 2007). As a result, instead of delving into the complexities of their inner identity and purpose, some people may automatically define themselves according to their economic status when asked, “Who am I?” Examples include “a prospective entrepreneur” or “an employee” in a government agency.

In addition to influencing how people see and seek out information, this emphasis on economic identity influences their everyday lives. At times, people value knowledge less for its inherent value or the deep insights it provides and more for its practical, teleological benefits, including getting ahead in one’s career, accomplishing worthwhile goals, or making money. Teleological goals, which are outcome-oriented, take priority over deontological principles, which are duty-based; knowledge is seen here as a means to an end rather than an end in itself. Sometimes people fail to consider the deontological side of knowledge, which is seeking out information for its own sake because it satisfies a natural human need to investigate, explore, and grow. If we ignore the potential benefits of knowledge for our humanity, ethics, and development in favor of its practical applications, we risk losing sight of its true value.

Moreover, a sort of pseudo-identity is fostered by technological and economic factors. Users are able to create carefully crafted virtual identities that highlight their best selves on social media and business networking sites. Rather than revealing genuine aspects of an individual, these platforms frequently highlight superficial qualities like popularity, attractiveness, and perceived accomplishment. As a result, many young people may feel forced to create these false identities, putting a premium on obtaining approval from others and succeeding academically rather than growing into their own unique character. This issue

is well demonstrated by the way young people carefully craft their online personas to conform to cultural norms rather than express their true convictions and worldviews. While this assumed persona might work in the present economic and social climate, it runs the danger of causing people to lose touch with who they really are. Questioning one’s purpose in life, one’s ethical responsibilities, and one’s meaning in life may fade into oblivion when financial stability and social approval take precedence. Here, philosophical thinking is sometimes seen more as a frivolous or unrealistic exercise than as a necessary component of human progress. The pursuit of information for the sake of self-awareness has given way, for many, to the utilization of knowledge as a means to succeed. Even with these changes, basic questions remain. Gaarder suggests in Sophie’s World that there is an innate desire for a philosophy that is never satisfied. Queries about life, purpose, and self-definition continue to pique people’s interest, even in the face of rapid technological development, shifting environmental conditions, and the increased pressures of modern living. Today, this fervor could manifest in new ways, perhaps as a result of adolescent disillusionment with the pursuit of success alone, a life shift, or a personal crisis. People may ask themselves, “Who am I?” and think about their place in the universe at these times, much as Sophie did.

By analyzing the original question of *Sophie’s World* and how it relates to modern society, it can be said that while technological advancements and economic forces have changed the way people think about philosophical issues, they have not done away with the inherent human need for introspection and reflection. In order to achieve both economic and existential self-identity, it is necessary to find ways to balance pragmatic goals with philosophical research. Even in this age of rapid technological advancement, the relevance of philosophy can be acknowledged by the youth of today if they can find ways to pause, think, and reengage with the eternal questions of human life.

References

Bauman, Z. (2007). *Liquid Life*. Cambridge: Polity Press.

Gaarder, J. (1991). *Sophie’s World: A Novel About the History of Philosophy*. (P. M. Smith, Trans.). New York: Farrar, Straus and Giroux.

Turkle, S. (2011). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. New York: Basic Books.

স্মৃতিতে চির ভাস্বর, চির অম্লান

অব্যক্ত-অস্পষ্ট থেকে গেল
দার্শনিক সব বোঝাপড়া
সৃষ্টি হলো এক বিশাল শূন্যতা

অধ্যাপক আয়েশা সুলতানা

(২৯/১২/১৯৪২ - ২২/১০/২০২৪)
প্রাক্তন চেয়ারপার্সন (৬/৭/২০০০ - ৫/৭/২০০২)
দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক আয়েশা সুলতানার মৃত্যুতে ২৯/১০/২০২৪ তারিখে
দর্শন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত শোকসভায় বক্তব্য রাখছেন
বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী

ফিরে দেখা

দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী মেহেদী হাসানকে ১৭/৭/২০২৪ তারিখে শাহবাগ থানা থেকে ছাড়িয়ে আনতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকের সঙ্গে বিভাগীয় শিক্ষক ড. কাজী এস এম নুরুল হুদা ও জনাব খন্দকার তোফায়েল আহমেদ

সাফ উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪ জয়ী বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের গর্বিত সদস্য ও টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী ঋতুপর্ণা চাকমা

Title of the Curriculum:
Outcome-Based Education (OBE)
of
the Dpertment of Philosophy

Four-year Undergraduate Program
Sessions: 2023-24, 2024-25, 2025-26, 2026-27

Dpertment of Philosophy
University of Dhaka

ওবিই ফ্রেমওয়ার্ক অনুসরণে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের জন্য চালু হওয়া বিভাগের নতুন সিলেবাস

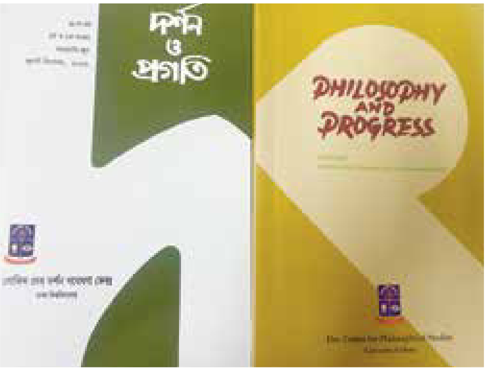

গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র থেকে ৪০ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত দুটি জার্নালের সর্বশেষ সংখ্যা

দর্শন বিভাগ, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র ও নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্র এর যৌথ উদ্যোগে ২৫/৫/২০২৪ তারিখে আয়োজিত "শিক্ষকতায় নৈতিকতা" শীর্ষক সেমিনার ও ওয়ার্কশপে ঢাবির অধিভুক্ত কলেজসমূহের অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের একাংশ

অমর একুশে বইমেলা ২০২৪ এ বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মো. নূরুজ্জামানের প্রকাশিত গ্রন্থ *ছোটদের জন্য দর্শন*

বিশ্ব দর্শন দিবস ২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালি

বিশ্ব দর্শন দিবস ২০২৩ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন

২০২৪ সালে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণ সহায়তায় দর্শন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা ২০২৪ এ দলীয় সঙ্গীত পরিবেশনায় দর্শন বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ

শিক্ষা সফর ২০২৩ এ দর্শন বিভাগের এমএ শ্রেণির শিক্ষার্থীবৃন্দ

দর্শন বিভাগের নতুন কার্যালয়ে মহান দার্শনিক সক্রেটিসের ম্যুরাল

দর্শন বিভাগ
গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র
ও
নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২১ নভেম্বর ২০২৪, বৃহস্পতিবার, সকাল ১০:০০ মিনিট
স্থান: ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তন

অনুষ্ঠানসূচি

র‍্যালি (অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে)	সকাল ০৯:০০ মিনিট
অতিথিদের আসন গ্রহণ:	সকাল ১০:০০ মিনিট
স্বাগত ভাষণ:	
অধ্যাপক ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী, চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সকাল ১০:০০ মিনিট
শুভেচ্ছা বক্তব্য:	
অধ্যাপক নিলুফার ইয়াসমিন, বিভাগীয় প্রধান, দর্শন বিভাগ, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা	সকাল ১০:১০ মিনিট
ড. কাজী এ এস এম নুরুল হুদা, সম্পাদক, *বিশ্ব দর্শন দিবস ২০২৪ স্মরণিকা*	সকাল ১০:২০ মিনিট
মূল প্রবন্ধ:	
অধ্যাপক আ খ ম ইউনুস, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সকাল ১০:৩০ মিনিট
বিশেষ অতিথির ভাষণ:	
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, ডিন, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সকাল ১১:০০ মিনিট
প্রধান অতিথির ভাষণ:	
অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সকাল ১১:১০ মিনিট
সভাপতির ভাষণ:	সকাল ১১:২৫ মিনিট
ধন্যবাদ জ্ঞাপন:	
অধ্যাপক মো. নূরুজ্জামান, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সকাল ১১:৩৫ মিনিট